বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০০১

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০১

উপদেষ্টা
স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ

পৃষ্ঠপোষক
সুব্রত গাঙ্গুলি

প্রকাশক
তপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
গৌতম গোস্বামী

সম্পাদকমণ্ডলী
বিশ্বনাথ দাস
কমলেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

টাইপসেটিং
সার্ভিস প্রিন্টার্স, ৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০

মুদ্রণ
পি.এম.বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

৩ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : জাস্টিস মলয়কুমার বসু
গৌতম গোস্বামী

৭ প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন
তপনকুমার ঘোষ

৯ বিদ্যামন্দির— ষাট বৎসরের একটি সমীক্ষা
সচ্চিদানন্দ ধর

১২ বিদ্যামন্দির সমাচার

১৫ সৃষ্টি : আত্মপরিচয় ও আলোচকের চোখে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

২৪ কৈলাস-মানস সরোবর
স্বামী সর্বগানন্দ

২৮ দিনপঞ্জির পাতা থেকে
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

৩১ বীরেনদা
সমীর সেনগুপ্ত

৩২ কবিতা
সুনীল সিংহ রায়

৩৩ বিদ্যামন্দিরের কাছে আমি ঋণী
আবুতৈয়ব-উর-রহমান

৩৫ প্রবাসীর চিঠি
স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ

সম্পাদকীয়

শতক অতিক্রমের উৎসব শুরু হয়েছিল বছর খানেক আগে। সে উৎসবের রেশ এখনো নাচে-গানে-বিজ্ঞাপনে চোখে পড়ে। উৎসব হওয়ারই কথা কারণ একশ বছরের আগে এ-রকম উৎসবের সুযোগ আর মিলবে না। নতুন নতুন দশক আসবে কিন্তু নতুন শতককে ছুঁতে আরো একশ বছর।

কিন্তু এই উৎসবের গুরুত্ব যতখানি সময়ের দিক দিয়ে ঠিক ততখানি কি উপার্জনের হিসেবে? উপার্জনের কথা অস্বীকার করি না কারণ গত একশ বছরে পৃথিবীর বহু দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। আমাদের দেশও স্বাধীন হয়েছে এই শতকেই। আমরা ভুলে যেতে পারি না এই শতকে বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি হয়েছে। মানুষ চাঁদে গেছে এই বিশ শতকেই। পৃথিবীটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনের কারণে। এখন ইচ্ছেমতো চ্যানেল ঘুরিয়ে দেশ-বিদেশের খবর মেলে। কয়েক ঘণ্টায় উড়ে যাওয়া যায় এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। বাড়ি, গাড়ি, দপ্তরে এখন প্রখর গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বসন্তে নামিয়ে আনা যায় বাতানুকুল যন্ত্রের সাহায্যে। শীতেও বাড়িয়ে নেওয়া যায় ঘর বা বাইরের তাপমাত্রা। এ-সবই বিশের শতকে আমাদের উপার্জন।

এর পাশাপাশি এই সময়-সীমার ভেতরে ঘটে গেছে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের লাশ ছড়িয়েছে চারপাশে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিও এসেছে। মানুষের জীবন বিকিয়েছে জলের দরে। পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা পরমাণু বোমা বানিয়েছেন ক্ষমতা প্রদর্শনের উৎসাহে। জাতি-ধর্মের কৌলীন্য জাহির করতে মানুষ মেরেছে মানুষকে। উৎপাদনের চেয়ে উৎসাহ বেড়েছে কনসালটেন্সিতে। পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি কিন্তু বোতলে রঙিন জলের বাজার চাঙ্গা হয়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন ঘটলেও পৃথিবী জুড়ে অর্থ-পিপাসা দিনে দিনে বেড়েছে। টাকার নেশায় দুর্নীতির অংশীদার হয়েছে রাজনীতিবিদ, আমলা থেকে শুরু করে ক্রিকেট মাঠের অধিনায়ক থেকে মালী। টাকার নেশায় বন কেটে কারখানা হয়েছে এবং প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। টাকার নেশায় মানুষ বদলে নিচ্ছে ভাষা, বস্ত্র এবং দেশ। দেশটাকে বদলানোর চেয়ে দেশ বদলে নেওয়া অনেক সহজ— তাই গ্রীন কার্ডের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে কত তরুণ! এ বিশ শতকেই আমরা শিখেছি শিক্ষার চেয়ে শিক্ষার মাধ্যম জরুরি, ছবির চেয়ে ছবির নায়ক-নায়িকার নাম বেশি গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রনায়কদের কাজের চেয়ে বক্তৃতার ওজন ভারী হওয়া জরুরি, প্রতিবাদের প্রথম ও শেষ পদক্ষেপ বাধ্যতামূলক বন্ধ। এক সময় গোয়ালঘর থেকে মহামূল্যবান পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, এখন পাইপগান-বন্দুক উদ্ধার হয়।

বড় বে-হিসেবি এক সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। অনশন আর অনাহার সমান তালে চলছে। মোটা কাপড়ের জন্যে হাতপাতা আর ফ্যাশন শো পাল্লা দিয়ে হাঁটছে। মহাপুরুষ এবং চন্দন-চম্বলের দস্যুদের নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে একই সময়ে।

সময়ের যাওয়া-আসা নিয়ে উৎসব তো করাই যায় কিন্তু সেই তো নেহাতই ক্যালেন্ডারের পাতাবদল। নতুন শতকের বা সহস্রাব্দের জন্যে আমরা কী করতে চাইছি, কেমনভাবে গড়তে চাইছি তাকে? এখন বোধ হয় এ-রকম একটা ব্যক্তির নিজস্ব হিসেব-নিকেশ দরকার। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র। যদি সমাজ বা রাষ্ট্র না মানে তাহলে সংঘাতে যেতেই বা বাধা কোথায়? কারণ শেষ লক্ষ্য তো মানুষ— নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা জাতির, নানা দেশের। মানুষই ঈশ্বর— মানুষই সবচেয়ে বড়ো সত্য। সাধারণ মানুষের উপকারে না এলে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কিংবা জাতিতত্ত্বের সব জ্ঞানই স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন— প্রাণহীন।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : জাস্টিস মলয়কুমার বসু

সাক্ষাৎকার : গৌতম গোস্বামী

গৌতম : বিদ্যামন্দিরে আসার আগে কোথায় পড়তেন?

উ: বসিরহাট হাইস্কুলে। দেশভাগের শিকার হয়ে আমরা খুলনা জেলার একটি গ্রাম থেকে বসিরহাট মহকুমা শহরে আসি এবং ওই স্কুলে ভর্তি হই।

গৌতম : বসিরহাট থেকে বিদ্যামন্দিরে আসার সিদ্ধান্তটা নিলেন কেন?

উ: বিদ্যামন্দিরে আসার কারণ ছিল আমার বাবার আদর্শবাদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এরকম একটা বিশ্বাসের দ্বারা তিনি চালিত হয়েই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন বিদ্যামন্দিরে ভর্তি করতে।

গৌতম : আপনি যখন বিদ্যামন্দিরে পড়তে এসেছিলেন তখন বিদ্যামন্দিরের প্রাণপুরুষ স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ ছিলেন প্রিন্সিপাল। সেই প্রথম দিনের কোনো কথা কি আপনার মনে পড়ে?

উ: ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাবার হাত ধরে বিদ্যামন্দিরে এসেছিলাম বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে। প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজের একটি কথায়, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার এতদিনের লালিত ইচ্ছেটা, নিমেষে নাকচ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তুই আর্টসের ছেলে।' আজ বুঝি, কতখানি অন্তর্দৃষ্টি ওঁনার ছিল।

গৌতম : প্রথম দিনের আর কিছু আপনার মনে পড়ে?

উ: প্রথম দিন বিদ্যামন্দিরে এসে আমি কিন্তু বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রবল তাৎক্ষণিক আর্তি অনুভব করেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কারণে। বিদ্যামন্দিরের বাহ্যরূপে মুগ্ধ হয়ে। বিদ্যামন্দিরের পশ্চিমে ছিল একটি জলাশয়। অসংখ্য সবুজ পদ্মপাতায় ভরা। আষাঢ়ের বৃষ্টিধোয়া সেই দুপুরে গেরুয়া রঙের বিদ্যামন্দির ভবনের ছায়া পড়েছিল জলে। জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই ছায়া ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

গৌতম : কোন বিষয় নিয়ে পড়েছিলেন?

উ: আমার বিষয় ছিল পিওর আর্টস। সিভিকস, হিস্ট্রি, সংস্কৃত এবং লজিক।

গৌতম : আপনি কোন্ হস্টেলে থাকতেন?

উ: প্রথমে আমার নাম উঠেছিল ইস্ট হস্টেলের খাতায়। প্রথমরাত্রি সেখানে ছিলামও। কিন্তু সেইসময় বিদ্যামন্দিরের দ্বিতীয় বর্ষে ওঠা ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত 'দেশের ছেলে'। তিনি ওয়েস্টে থাকতেন। নাম শ্রীরামরতন দাস। তিনিই মহারাজকে বলে পরের দিনই ওয়েস্ট হস্টেলে আমার ব্যবস্থা করেন।

গৌতম : তখনকার মহারাজদের কথা আপনার মনে আছে কি?

উ: মহারাজদের কথা উঠলে তো প্রথমেই পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গত স্বামী তেজসানন্দজীর কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। তিনি ব্যতীত ছজন মহারাজ আমাদের দু'টি হস্টেলে থাকতেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে, তাঁরাও সময়ের সরণিতে প্রোজ্জ্বল। কারণ প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই থাকত তাঁদের আশীর্বাদসমৃদ্ধ নিয়ন্ত্রণ। এঁরা হলেন ওয়েস্ট হস্টেলের শ্রদ্ধেয় তারাপদ মহারাজ (পরবর্তীকালে স্বামী অজজানন্দ); শ্রদ্ধেয় অনিল মহারাজ (আমাদের সিভিকস পড়াতেন), শ্রদ্ধেয় বলরাম মহারাজ (সম্ভবত লজিক পড়াতেন)। আর ইস্ট হস্টেলে ছিলেন শ্রদ্ধেয় গোপাল মহারাজ (ইতিহাস পড়াতেন), শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ মহারাজ— বর্তমানে স্বামী গোকুলানন্দ— (লজিক পড়াতেন) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজ (সিভিকস পড়াতেন)।

গৌতম : সেই সময়কার শিক্ষকদের কোনো কথা...

উ: অধ্যাপকদের মধ্যে মনে পড়ে শ্রীযুক্ত সুধাময় ঘোষ ও সুপ্রিয় করকে। উভয়েই ইংরেজি পড়াতেন। সুধাময় বাবুর মুখ বেঁকিয়ে এবং জিভ দাঁতে লাগিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ ছাত্রদের কাছে খুবই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল, অবশ্যই কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক সুপ্রিয় করের পড়ানো 'Jackdaw of Rhymes' নামক কবিতাটি এখনও কানে বাজছে। বাংলার অধ্যাপক শীতলবাবু ছিলেন

খোলামেলা মেজাজের লোক। ওঁর পড়ানোটা আমরা মন দিয়ে শুনতাম। নজরুলের 'ফরিয়াদ' কবিতাটি টীকা-টিপ্পনী সহকারে বোঝাতেন— এখনও যেন শুনছি। নীলমণিবাবু ইতিহাস, ললিতবাবু সিভিকসের মধ্যে 'ইকনমিক্স' অংশটুকু, হীরালালবাবু (চুরুট খেতেন) সংস্কৃত এবং মাখনলালবাবু লজিক পড়াতেন। মাখনবাবু "তাহলে" শব্দটিকে একটু নাকি সুরে "থালে" বলে উচ্চারণ করতেন। এই বিশেষ কারণে হয়তো মনের অ্যালবামে তাঁকে নিয়ে কিছু বিশেষ মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

গৌতম : মলয়দা, আমাদের দুঃখ হয় আমরা তেজসানন্দজীর কথা শুনেই এসেছি— সান্নিধ্য পাইনি। তেজসানন্দজীর আপাতকঠিন কিন্তু কোমল হৃদয়ের কোনো ঘটনার সম্মুখীন আপনি হয়েছেন কি?

উ: একটা ঘটনার কথা আমার মানসপটে এখনও উজ্জ্বল। বিদ্যামন্দিরে তখন বার্ষিক অনুষ্ঠান হত। নাটক, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি থাকত। স্বামী তেজসানন্দজী স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে প্রস্তুতিপর্ব পরিচালনা করতেন। বিশেষত নাটকের রিহার্সাল তিনি নিজে দেওয়াতেন। সেবার "বিজয়সিংহ" নামক নাটকটি মঞ্চস্থ হবে বলে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি আমাদের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছিলেন। একদিন হল কি, একসাথে প্রায় সাত-আট জন ছাত্র-অভিনেতা আসতে দেরি করে। স্বামীজী এসে অপেক্ষা করছেন অথচ তারা আসছে না। উনি প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ ছিলেন। অস্থিরভাবে তিনি পদচারণা করতে লাগলেন। বিলম্বে তারা যখন হাজির হল, মহারাজের রোষবহ্নির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। কঠোরভাবে তিনি ঐ সাতটি ছেলেকে বলে দিলেন পরের দিন সকালেই যেন তারা "প্যাক আপ" করে চলে যায় বিদ্যামন্দির থেকে। আমরা যারা সময়ে হাজির হয়েছিলাম, কম্পিত হৃদয়ে যে-যার হস্টেলে ফিরে এলাম। কিন্তু আমাদের ভীতিবিহ্বল মুখচাওয়া-চাওয়িকে মিথ্যা প্রমাণিত করে রাত্রি দশটার সময় খবর এল যে মহারাজ ওদের সকলকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি মানসপটটি তাঁরই অন্তরে বহমান অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

গৌতম : বিদ্যামন্দিরের আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা...

উ: গৌতম, বিদ্যামন্দিরের কথা উঠলেই অনেক ঘটনার কথাই মনে পড়ে যায়। তোমাকে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলছি যেটা ঘটেছিল আমার প্রথম বর্ষের রুমমেট প্রলয় ব্যানার্জীকে নিয়ে। শীতকালীন ছুটির সময়ে একবার আমাদের হস্টেলের জনা বিশেক ছেলেকে নিয়ে তারাপদ মহারাজ ও অনিল মহারাজ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। আমাদের ট্রেনটি বিহারের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করার পর থেকেই নানা উৎপাত শুরু হল। কোনো একটা স্টেশন থেকে একদল 'মস্তান' ছেলে উঠেই আমাদের সিট থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা দখল করার চেষ্টা চালাল। শ্রদ্ধেয় অনিল মহারাজ সামান্য প্রতিবাদ করায় তারা তাঁর প্রতি ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসে এবং তাঁর শিখা স্পর্শ করার স্পর্ধা প্রদর্শন করে। আমরা অতগুলি ছেলে বিমূঢ় এবং কিছুটা সন্ত্রস্ত। এইসময় ক্ষিপ্রবেগে বাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে আসে প্রলয় এবং একা অতগুলি উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে তার দশাসই অবয়বটি শুধুমাত্র দৃশ্যতই বলিষ্ঠ নয়, এটি তেজস্বী মনেরও বাহক। আমাদের চোখের সামনে আমাদের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর যে লাঞ্ছনা সেদিন ঘটতে চলেছিল তা এইভাবে রুখে দেওয়ায় প্রলয় সেদিন আমাদের কাছে রাতারাতি হিরোতে পরিণত হয়।

গৌতম : বিদ্যামন্দির থেকে বেরিয়ে কী করলেন?

উ: বিদ্যামন্দির থেকে আই. এ. পাশ করে আমি কলকাতায় ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করি। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই সঙ্গে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. ও আইন পাশ করি।

গৌতম : আপনি হঠাৎ আইনের পেশায় এলেন কেন?

উ: আইনের পেশায় আসাটা আদৌ আকস্মিক ছিল না, আইন পড়ার বাসনা প্রবলভাবে তাড়িত করেছিল। আমাদের সময়ে বি. এ. ক্লাসে Burke-এর *Conciliation with America* নামক বইটি টেক্সট হিসাবে পড়তে হয়েছিল। তাতে একজায়গায় এই ইংরেজ মনীষী-র একটি উক্তি আমাকে প্রভাবিত করেছিল। কথাগুলি হল— 'Study of law makes a man acute, inquisitive, dexterous, prompt in attack, ready in defence and full of resources.' তাছাড়া একটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে একটি লাইন পড়েছিলাম— 'To be a good citizen one must be a law-knowing person.' বুঝেছিলাম আইনের মধ্যেই প্রতিফলন ঘটে মানুষের জীবনদর্শনের। ল কলেজে আমার ভর্তি হওয়ার অনুপ্রেরণা এভাবেই এসেছিল কারণ আমাদের বংশে কোনো ল-ইয়ার ছিল না। কিন্তু আইন পাশ করার পরে তেমন ভালো কোনো সিনিয়র-এর সন্ধান না পাওয়ায় ওকালতি করা হয়ে ওঠেনি। ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়ে জুডিসিয়াল সার্ভিসে আসি। তার আগে অবশ্য গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে লেকচারার-এর পদ পেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

গৌতম : আপনি যখন জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন সেই সময়

এক্সিকিউটিভদের হাতেই তো ফৌজদারি মামলার বিচারের দায়িত্ব থাকত?

উ: এটা তুমি ঠিক কথা বলেছ। খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটা। আমাদের জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগ দেবার অব্যবহিত পরেই শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং আমাদের শাসনতন্ত্রের একটা প্রধান directive principle— Separation of the judiciary from the executive— এর implementation হয়। এর ফলে বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

গৌতম : আপনার এই আইনজ্ঞের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটা?

উ: আমার বিচারক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে অবশ্যই তা ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়াকেই করব।

গৌতম : আপনি আপনার বিচারক জীবনে বহু কেসের রায় দিয়েছেন— সে সিভিলই হোক বা ক্রিমিনাল-ই হোক। আইনের একটা প্রধান উপকরণ হল— 'প্রমাণ'। প্রধান প্রতিবন্ধকতা-ও প্রমাণ। প্রমাণের অভাবে অনেক অপরাধীই পার পেয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে?

উ: একজন বিচারক হিসাবে অসংখ্য মামলার সুষ্ঠ নিষ্পত্তি করতে পেরে সন্তোষলাভ করেছি। বিচারকের লক্ষ্য সর্বদা সত্যে উপনীত হওয়া। যে-কোনো মামলাতেই— তা সিভিলই হোক আর ক্রিমিন্যাল-ই হোক। প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে কি না— বিচারককে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। দেওয়ানি মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ সন্তোষজনক না হলে যেমন বাদীর প্রার্থিত ডিক্রি প্রদান সম্ভব হয় না, তেমনই ফৌজদারি মামলায় অপরাধীর বিরুদ্ধে গঠিত চার্জ যদি সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে সম্পূর্ণ এবং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয় না। এর ফলে বহু মামলায় অভিযুক্তরা Criminal jurisprudence-এর এই 'golden thread' এর ফাঁক দিয়ে গলে যায়। অজস্র ফৌজদারি মামলায় আসামিকে খালাস দিতে হয় এই নীতি পালন করতে গিয়ে, যদিও ঘটনাবলির বিন্যাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে অভিযুক্তই অপরাধটির প্রকৃত সংঘটক। এই সব ক্ষেত্রে বিচারকদের ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, অভিযুক্ত আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে হয়। সাধারণের মধ্যে অনেক সময় ভুল সংকেত বাহিত হয়। যাঁরা এই নিয়মকানুনগুলির প্রয়োগের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে অনবহিত, তাঁরা স্বভাবতই গেল গেল রব তুলতে পারেন। তাঁরা ভাবতে পারেন যে এত বড় দগদগে আসামি কি না এত বড় অপরাধের স্রষ্টা হয়েও কোনো শাস্তি পেল না! সত্যি কথা বলতে কি, এরকম অবস্থায় বিচারকের অসহায়তা মর্মস্পর্শী। এই প্রসঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের একটা বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে— 'Law is an ass.' অবশ্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে হলে এই নীতির প্রয়োগ অপরিহার্য।

গৌতম : নানা রকমের রোগ ঘাঁটতে ঘাঁটতে ডাক্তাররা যেমন মানুষের শরীরের ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, তেমনি নানা রকমের কেস ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিচারকরাও নিশ্চয়ই মানুষের মনের ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আপনি প্রচুর কেস দেখেছেন, ঘেঁটেছেন। এমন কোনো কেসের কথা কি আপনার মনে পড়ে যার রায় দিয়ে আপনি আনন্দ পেয়েছেন বা দুঃখ সহকারে, রায় দিয়েছেন?

উ: গৌতম, তোমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তরদান অনভিপ্রেত। বিচারককে নিরপেক্ষ, নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত মন নিয়ে বিচারাসনে বসতে হয়। অপরাধীর সাজা পাওয়া, না-পাওয়ার সঙ্গে বিচারকের ব্যক্তিগত আনন্দ বা দুঃখকে যুক্ত করা একান্তই অসমীচীন। তবে দু'টি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় বিবাদমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা মিলন ঘটাতে পেরেছিলাম। এবং উভয় ক্ষেত্রেই দু/তিনটি শিশু-সমন্বিত এই পরিবারগুলির অবশ্যম্ভাবী ভাঙন রোধ করতে পেরে অপরিসীম আনন্দ পেয়েছিলাম।

আবার তেমনই একটি আসামিকে তার স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিতে হয় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই কারণে যে এই দম্পতির চারটি নাবালক সন্তান— যারা মাতৃহীন হয়েছিল— এবারে তারা একেবারে অনাথ হয়ে গেল।

গৌতম : সাধারণ মানুষ দেখছে যে একবার বিচার শুরু হলে তা চলতেই থাকে, নিষ্পত্তি হয় বহু বছর পর। বিচারের এই শ্লথগতির কারণ কী?

উ: বিচারের শ্লথগতির কারণ একাধিক। প্রথমত এর পদ্ধতিগত বিলম্ব। বিভিন্ন আইনে যে পদ্ধতি আইনের প্রণেতাগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সঠিক এবং অপরিহার্য বলে দেখা গেছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব ঘটে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি একটি মামলার অগ্রগমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রুততায় কার্যসাধন করেন না— যা বিলম্বকে দীর্ঘতর করে তোলে। এখানে অনস্বীকার্য যে আদালতের তরফে এরকম ক্ষেত্রে কিছু করার থাকে। বিচারক একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। পক্ষদের তরফ থেকে মামলার শুনানি বিলম্বিত করার অপপ্রয়াসকে খর্ব করতে পারেন দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে আমাদের সংবিধানের ২১ নং ধারাতে বলা হয়েছে— 'No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.'

গৌতম : এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের তো কিছু জাজমেন্ট আছে বলে শুনেছি?

উ: হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এই 'Right to personal liberty'-র ভিত্তিতে আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট নানা কেসে কিছু যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে বিলম্বিত বিচারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন এবং এই বিষয়ে আইনের অধ্যায়ে এক নুতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই

বিধান আজ আইনের ধারার মতো বলবৎ হচ্ছে এবং যেখানেই বিলম্বিত বিচার কোনো ব্যক্তির সংবিধানের দেওয়া এই মূল্যবান অধিকার-এর পরিপন্থী বিবেচিত হচ্ছে সেখানেই এই রুলিং প্রযুক্ত হয়ে অবিচারের মাত্রাকে যথাসম্ভব হ্রাস করে দিচ্ছে।

গৌতম : সাধারণ মানুষ তো দেখছে কোনো অপরাধী দশ বছর আগে মারাত্মক অপরাধ করে দশ বছর পরে শাস্তি পাচ্ছে, আইনের মারপ্যাঁচে সে দশ বছর বেঁচে যাচ্ছে যদিও সাধারণ মানুষদের চোখে সেই অপরাধীর একদিনও বাঁচা উচিত নয়।

উ: কোনো অপরাধীর একদিনও বাঁচা উচিত নয়, অথচ দশ বছর বেঁচে যাচ্ছে এ ধরনের ধারণা যুক্তিসম্মত নয়। এরকম কোনো আইনের শর্ত নেই যে অপরাধ করে অপরাধী একদিনেরও বাঁচার অধিকার হারিয়েছে। বিচারের পরেই স্থির হবে যে সত্যই বাঁচার অধিকার হারিয়েছে কী না। আর আইনের মারপ্যাঁচে সে যদি দশ বছর বেঁচে থাকে তার জন্যে কিছু করার থাকে না, যতক্ষণ না সেই আইনটির সুষ্ঠু সংশোধন হচ্ছে।

গৌতম : আইনের প্রয়োগ এবং রক্ষা যাদের হাতে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ আজ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে এবং আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। আপনি কি মনে করেন তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে নতুন আইনের প্রবর্তন প্রয়োজন?

উ: নৈতিক মূল্যবোধ ও সুবিবেক যতক্ষণ না প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে জাগরিত হচ্ছে ততক্ষণ সেই অবক্ষয় সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় এবং অবিবেকী কার্যকলাপ চলতেই থাকে। আইন করে মানুষের বিবেক বা মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো সম্ভব নয়।

গৌতম : আইনজ্ঞেরা কি আইনের উর্ধ্বে?

উ: আদৌ নয়। আমাদের শাসনতন্ত্রে আইনের শাসন বা Rule of Law-কে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। আমাদের Constitution-এ যে-কয়টি Fundamental Rights আছে তার মধ্যে প্রথমটাই হল— Right of equality before law. আইনের চক্ষে সবাই সমান। আইনজ্ঞ কেন, যে-কোনো ব্যক্তিই— সে যত উচ্চপদেই বৃত থাকুক না কেন— আইনের উর্ধ্বে নয়।

গৌতম : মলয়দা, অল্পবয়সীদের মধ্যে যে ভয়ানক অপরাধপ্রবণতা আজকাল দেখা যাচ্ছে— আপনার মতে, তার কারণ কী? হতাশা, চাকরির কম সুযোগ বা ভঙ্গুর পরিবার ব্যবস্থা কি এর জন্য দায়ী?

উ: বর্তমান প্রজন্ম তথা অল্পবয়সীদের মধ্যে যে অপরাধপ্রবণতা ক্রমবর্ধমান তার কারণ হিসাবে অনেকে কর্মাবস্থানের অভাবজনিত হতাশাকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু সে ধারণা আমার মতে সঠিক নয়। সে সব ক্ষেত্রে চাকুরিস্থ অথবা সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের মধ্যে এত বেশি হারে অপরাধপ্রবণতা জন্ম নিত না।

ভঙ্গুর পরিবার ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে অল্পবয়সীদের মনে। আগেকার দিনে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায়, বাবা-মা দুজনেই চাকুরিরত হলেও অন্য অনেকের সাহচর্য তারা পেত। আজ যৌথ পরিবার ভাঙতে ভাঙতে প্রায় তলায় এসে ঠেকেছে। বাবা-মা দুজনেই চাকরি করলেই তারা একা হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তারা পিতা-মাতার স্নেহ— যা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রাপ্য— তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের মানসিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হতে পারছে না এবং জন্ম দিচ্ছে অপরাধপ্রবণতা।

গৌতম : আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কী?

উ: আমি মনে করি আজকের এই যুবসমাজের মধ্যে সর্বনাশা উন্মার্গগামিতার প্রধান কারণ আজ আমাদের বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব।

গৌতম : আপনি কি মনে করেন এটা দূর করতে আপনার, আমার— সবার সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে? কী করা উচিত?

উ: আমরা কেউই সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সচেষ্ট হতে হবে সক্রিয়ভাবে— সেই পূর্বদিনের মূল্যবোধগুলি আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরে। শিশুর জ্ঞানলাভের পর থেকেই তাকে মূল্যবোধের শিক্ষাদানে আলোকিত করে তুলতে হবে— ভয়ংকর অপরাধ প্রবণতা যাতে তার মধ্যে জন্ম নিতে না পারে। দেহের অভ্যন্তর থেকে রোগ উৎপত্তির কারণকে যদি বিনষ্ট না করা যায় তাহলে ঔষধ প্রয়োগে রোগের নিরাময় কেবলমাত্র সাময়িকভাবেই করা যেতে পারে, রোগের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। অতএব আমার মতে মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন আজকের এই বিধ্বংসী অবক্ষয়ের হাত থেকে বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে। আর্থিক প্রাচুর্য নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগমন নয়। অথবা শুধুমাত্র কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে নয়।

গৌতম : একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনার এই জীবনে আপনি অনেক কিছু দেখেছেন, করেছেন, আবার অনেক বাধারও সম্মুখীন হয়েছেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন, দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উ: ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ উঠলে আমার শৈশব বা কৈশোরের দিনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ছোটবেলায় আমাদের তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর খুলনা জেলা থেকে বাড়ি-ঘরদোর ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। এদেশে এসে বাবাকে নতুন করে গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। ফলে আমার বাল্যকাল তথা ছাত্রজীবন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে এসেছি বলেই কিনা জানি না দীন-দুঃখী, অত্যাচারিতদের জন্য মনটা সর্বদা ক্রন্দনশীল। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই যেন আমার পরমার্থ লাভ ঘটবে। আমার এই কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা এই কারণে যে শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দ তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে প্রত্যাদেশ অহরহ দিয়ে গেছেন তা কায়মনোবাক্যে পালন করার জন্য যে মানসিক ক্ষেত্র প্রয়োজন তা যেন আমরা প্রস্তুত করে তুলি— এই চেতনা যেন বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বিস্তারিত হয়।

প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন

চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন ১৯৯৯-২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ১৫ অগস্ট ২০০০

ত প ন কু মা র ঘো ষ

প্রাক্তনী সংসদের চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভায় সমাগত সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। ১৯৯৭-৯৮-এ বর্তমান কর্মসমিতি কার্যভার গ্রহণ করে। বর্তমান কর্মসমিতির এটিই শেষ বার্ষিক সভা। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় সংসদের কাজকর্ম মোটামুটিভাবে একটি নির্দিষ্ট চেহারা পেয়েছে। সব কাজ করা গেছে এমন নয় তবু নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রাক্তনী সংসদ এগিয়ে চলেছে। বিগত ১৯৯৯-২০০০-এ সংসদের কাজকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

কার্যকরী সমিতির সভা ও সদস্য সংখ্যা : বিগত ৩১ মার্চ ২০০০-এর মধ্যে কার্যকরী সমিতির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সদস্যরা নানা উপলক্ষ্যে, আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, মিলিত হয়েছেন অনেকবার। সমিতির সক্রিয় প্রচেষ্টায় সদস্যসংখ্যা বেড়েছে। এখন সংসদের মোট সদস্য ৬৭৬ জন, এর মধ্যে ৬৫৬ জন আজীবন এবং ২০ জন সাধারণ বার্ষিক সদস্য। আমাদের সক্রিয় চেষ্টায় বার্ষিক সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে সাধারণ সদস্যসংখ্যা কমেছে কারণ বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে যাঁরা তিন বছরের অধিককাল সংসদের চাঁদা বাকি রেখেছেন তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে।

স্বামী তেজসানন্দ রচনা সংগ্রহ : ১৫ অগস্ট ১৯৯৯ তারিখে অর্থাৎ গত বার্ষিক সাধারণ সভার দিনে স্বামী তেজসানন্দ রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সুধীজন কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। আমরা মনে করি এই প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা একটি ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের আচার্য-ঋণ কিছুটা পরিশোধ করতে পেরেছি। তবে, গ্রন্থের বিক্রি আশানুরূপ না হওয়ায় প্রকাশনা তহবিলে ঘাটতি থেকে গেছে। যে সমস্ত সদস্য প্রাক্-প্রকাশনা গ্রাহক হয়েছিলেন— তাঁদের অনেকেই সংকলনটি এখনও সংগ্রহ করেননি। তাঁদের অনতিবিলম্বে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই। এখন এই মূল্যবান সংকলনটি ২০% মূল্যহ্রাসে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, উদ্বোধন এবং সারদাপীঠের বিক্রয় কেন্দ্রে বইটি বিক্রির জন্য রাখা আছে। এবারে 'কলকাতা বইমেলা'-তেও প্রচারপত্রসহ বইটি বিক্রির চেষ্টা হয়েছে। তবু, আমাদের হাতে অনেক বই এখনও অবিক্রীত রয়ে গেছে। ঠিক মতো বিক্রি করতে পারলে, ঘাটতি মিটিয়ে আমরা কিছু উদ্বৃত্ত-ও রাখতে পারবো। স্থির হয়েছে এই উদ্বৃত্ত অংশত ব্যয় করা হবে বিদ্যামন্দিরের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেবার জন্য। আপনাদের অনুরোধ— আপনারা গ্রন্থটি সংগ্রহ করুন— অন্যদের সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করুন।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুব দিবস : হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া এবং নদীয়া জেলার পর এবার বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। সাংগঠনিক সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করে ৯৪টি বিদ্যালয়ের প্রায় একহাজার ছাত্রছাত্রী। জেলাস্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সারগাছিতে—১৬ ডিসেম্বর। মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ১৬ জানুয়ারি ২০০০, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছিতে। এই উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্মারকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সারগাছি বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে এবারের সম্মেলন যুক্ত হওয়ায় সমগ্র জেলায় বিপুল সাড়া পড়ে— আশ্রমকর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সফল হয়।

প্রাক্তনীবার্তা : এবারে 'প্রাক্তনীবার্তা'-র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। নানাকারণে এবারের সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয়। 'প্রাক্তনীবার্তা' নানাস্তরে সুধীজনের ব্যাপক প্রশংসা আদায়ে সক্ষম হয়েছে এবং বাংলা পত্রপত্রিকার জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন বিদ্যামন্দিরের অন্যতম প্রাক্তনী ড. সুব্রত গাঙ্গুলি। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে এবং লেখাপত্র পাঠিয়ে আপনারা পত্রিকাটিকে দীর্ঘজীবী হতে সাহায্য করবেন আশা করি। সম্পাদক ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্ম-সম্পাদক গৌতম গোস্বামী চিরাচরিত আগ্রহেই প্রকাশনার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

স্বামী বিমুক্তানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্মারক বৃত্তি : বিগত ২৭ নভেম্বর তারিখের কার্যকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে স্বামী বিমুক্তানন্দজী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর নামে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান ছাত্রদের দুটি বৃত্তি দেবে প্রাক্তনী সংসদ। সেই অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরে পাঁচটি শ্রেণীর মোট পাঁচজনকে মাসিক ১০০ টাকা

করে বৃত্তিও দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ অতি সামান্য। আপাতত অন্তত এক লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল তৈরি করতে চাই আমরা। উল্লেখ্য, এই তহবিলে ইতিমধ্যেই প্রাক্তনীদের অনেকেই সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করেছেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ দান করেছেন ১৫০০০ টাকা। ওহিওবাসী বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী ডাঃ আশিসকুমার বসু এই তহবিলে ২৫০০০ টাকা দান করেছেন। প্রাক্তনী রবীন মুখোপাধ্যায় এই তহবিলে দান করেছেন ১০০০০ টাকা। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিদ্যামন্দিরের এখন কিছু প্রতিবন্ধী ছাত্রও পড়াশুনা করে। তাদের প্রতি আমাদের যথাবিহিত কর্তব্য করা প্রয়োজন। দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী সতীর্থদের পাশে দাঁড়াবার এই সুযোগ আপনারা কাজে লাগালে আশা করি বর্তমান শিক্ষাবর্ষে আমরা বৃত্তির পরিমাণ আরো বাড়াতে পারব।

আর্থিক সহায়তা : বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাবমতো 'কারগিল তহবিল'-এ পাঁচ হাজার টাকা অর্থসাহায্য পাঠানো হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারেও বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান করণিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মোট ১,২০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

মানিকতলা স্বাস্থ্যপ্রকল্প : ১৯৯৩-এর ৪ জুলাই প্রকল্পটির উদ্বোধন হয়েছিল। বিগত ৭ বছর ধরে এই প্রকল্প স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেক প্রাক্তনী প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন। প্রকল্পের আহ্বায়ক সংসদের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক অভিজিৎ রায় চাকুরিসূত্রে অন্যত্র চলে যাওয়ায় বর্তমানে এটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এটির দক্ষ পরিচালনার অভাব আমাদের দুশ্চিন্তায় রেখেছে। এ ব্যাপারে কলকাতায় প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী প্রাক্তনীদের কাছে আমরা সাহায্যপ্রার্থী। দীর্ঘদিনের উদ্যোগে তিলে তিলে গড়ে তোলা এই প্রকল্পটি যাতে দীর্ঘজীবী হয়— আশা করি আপনারা আজ সক্রিয়ভাবে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। এ প্রসঙ্গে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সদস্যদের জানাচ্ছি যে বিদ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পিনাকীপ্রসাদ ভট্টাচার্য আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে নিয়মিত প্রকল্প এলাকায় গিয়ে এটিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি তাঁর এই দৃষ্টান্ত প্রাক্তনীদেরও উৎসাহিত করবে।

পুনর্মিলন উৎসব : আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ বিদ্যামন্দিরের পরবর্তী পুনর্মিলন উৎসব। বিদ্যামন্দিরের হীরক জয়ন্তীর প্রাককালে আয়োজিত এই উৎসবে আপনারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, এই আমাদের আশা। এই উপলক্ষে একটি স্মারকপত্রিকা প্রকাশিত হবে। আশা করি এই পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে আপনারা সাহায্য করবেন। প্রাক্তনীদের উৎসবের সংবাদ জানিয়ে দেবেন এবং যোগদানে সাদর আমন্ত্রণ জানাবেন— সকলকে এই অনুরোধ জানাই।

রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা : প্রাক্তনী সংসদের আজীবন সদস্য শ্রীতারাপদ দাসের ব্যক্তিগত দানে 'রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা তহবিল' তৈরি হয়েছে। স্থির হয়েছে রানী রাসমণি ছাড়াও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মহীয়সী নারীদের প্রসঙ্গও আলোচিত হবে এই বক্তৃতামালায়। আমরা আজই সকাল ১১টায় এই বক্তৃতামালার উদ্বোধনী বক্তৃতাটি শুনলাম। এখন থেকে প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভার দিনেই এই স্মারক বক্তৃতাটি আয়োজিত হবে।

শোক সংবাদ : মাত্র কিছুদিন আগে প্রাক্তনীসংসদের সদস্য বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীসুশীল মল্লিক লোকান্তরিত হয়েছেন। এই আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। প্রয়াত হয়েছেন সংসদের আর একজন আজীবন সদস্য— শ্রীসনৎকুমার মিত্র। সংসদের কাজকর্মে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাঁর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি। বিগত ২৮ জুলাই ২০০০ তারিখে বিদ্যামন্দিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্বজন স্বামী কালিকাত্মানন্দজী মহারাজ লোকান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘকাল বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বিদ্যামন্দির পরিবারের সকলের অত্যন্ত আপন হয়েছিলেন। এঁদের প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।

কৃতজ্ঞতা : আপনারা অবগত আছেন যে বর্তমান কর্মসমিতি কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সংসদের সম্পাদক চন্দ্রনাথ দে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা স্বজন বিয়োগের বেদনা বোধ করেছি। তাঁর অসমাপ্ত কার্যভার সামলাতে বর্তমান সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সাধ্যমত সেই দায়িত্ব-পালনের চেষ্টা করেছি। বর্তমান কর্মসমিতির প্রতিটি সদস্যের পক্ষ থেকে সংসদের কাজকর্মে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যামন্দিরের কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, উপাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সংসদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হত না। এ ছাড়া বিদ্যামন্দিরের অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারী মহারাজগণ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, এবং ছাত্ররাও নিয়মিতভাবে সংসদের কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অন্যান্য বছরের মতো এবছরের হিসাবপত্রও বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষা করেছেন কলকাতার মনীষীকুমার দেব অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষে প্রাক্তনী মনোজ ভট্টাচার্য। কোষাধ্যক্ষ স্বপনকুমার চক্রবর্তী নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দক্ষ হাতে হিসাব রক্ষণের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। সংসদের আংশিক সময়ের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঘোষ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বিবরণী থেকেই বোঝা গেল— সংসদের কাজ-কর্মের পরিধি বেড়েই চলেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাজকর্ম চালিয়ে যাবার মতো আর্থিক সংগতি আমাদের নেই। বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য স্থায়ী তহবিল তৈরি করতে হলে আমাদের আর্থিক সম্বল বাড়ানো দরকার। এ বিষয়ে সদস্যরা সক্রিয় চিন্তাভাবনা করবেন, আশা করি। আর্থিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা— আর একটি সমস্যা হল সংসদের বহুমুখী কাজকর্মে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব। কাজকর্ম ঠিকমতো চালাতে হলে তরুণতর প্রাক্তনীদের সক্রিয় উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসতেই হবে। আজ নতুন কর্মসমিতি নির্বাচিত হবে। আমি আশা করব সক্রিয়ভাবে সংসদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন এবং কাজকর্মে সময় দিতে পারবেন এমন সদস্যরা আরো বেশি করে কর্ম সমিতিতে আসবেন। বহুজনের অর্থ, সময়, উদ্যোগ, শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ নিয়ে তৈরি হয়েছে সংসদ। আমরা যেন এই সংগঠনের গুরুত্ব এবং এটির প্রতি আমাদের কর্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করি। নতুন কর্মসমিতিকে স্বাগত জানিয়ে আপনাদের প্রতি আর একবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

তপনকুমার ঘোষ
কর্মসচিব

বিদ্যামন্দির—ষাটি বৎসরের একটি সমীক্ষা

সচ্চিদানন্দ ধর

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সময়ই স্বামীজী 'বিদ্যামন্দির' প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে বিদ্যামন্দির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যক্তিজীবনকে দেবত্বে উন্নীত করে সমগ্র বিশ্বকে সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আদর্শ 'দেব-মানবের' চরিত্র সৃজন করাই বিদ্যামন্দিরের মূল লক্ষ্য। এই বিদ্যামন্দির স্বামীজীরই পরিকল্পিত।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কালে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করার সময় স্বামীজী লেখেন :

"... ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রচারকার্যের জন্য একদল যুবক-সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার আশা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে। একদল যুবককে বৈদিক গুরুগৃহবাস প্রথায় শিক্ষা দিবার চেষ্টাও করা হইতেছে।

"আমাদের ইচ্ছা ... যতজন সম্ভব যুবককে মঠে রাখিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। উহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহাদের গুরুর নিকট বাস করিয়া পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা অর্জন করিবে।"

(বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬)

বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে স্বামীজী যে প্রতিষ্ঠানে 'গুরুগৃহবাস প্রথায়' 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা' দিতে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা-ই ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই 'বিদ্যামন্দির' রূপে বাস্তবায়িত হল।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিমাপে সার্থকতার বিচার

বিদ্যামন্দিরের বয়স ষাট বৎসর হতে চলল। এর হীরক জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলছে। আমরা অনেকেই ভাগ্যবান যে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকে ষাট বৎসরের পরিণতি দেখতে পেয়েছি। আমাদের বিদ্যামন্দিরের ছাত্রজীবনে, খুব কম সংখ্যক বিদ্যার্থীই বিদ্যামন্দিরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকি। ছাত্রজীবনে অধ্যক্ষ এবং আচার্যেরা পাঠ্য বিষয় পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে, ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাসে, প্রার্থনাগৃহে এবং বিশেষ বিশেষ সভাদিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রসঙ্গ এবং ধর্মশাস্ত্রাদির প্রসঙ্গ করে থাকেন। 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' বিষয়ে রুটিন মতো ক্লাস এবং বাধ্যতামূলক পরীক্ষাও হয়। প্রবন্ধ, বিতর্ক, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমেও ধর্মাদি বিষয়ে বিদ্যার্থীগণকে জ্ঞান দেওয়া হয়। কিন্তু এই বয়সে ভাবী জীবনের প্রতিষ্ঠালাভের কল্পনা এবং উচ্চাভিলাষের প্রেরণায় আমাদের মনে এইসব উচ্চভাবের কথা বিশেষ একটা স্থান পায় না। তবে, কোনো কোনো উচ্চসংস্কারসম্পন্ন ভাগ্যবান যুবক বিদ্যামন্দিরের ছাত্রজীবনেই স্বামীজীর 'দেবত্ব বিকাশের' আদর্শের সঙ্গে নিজের জীবনচর্যাকে মিলিয়ে দিয়ে সার্থক জীবনের অধিকারী হয়েছেন। ছাত্রজীবনে বহুশ্রুত এবং সন্ন্যাসী ও অ-সন্ন্যাসী আচার্যদের ব্যক্তিজীবনে দৃষ্ট আদর্শের একটা মোটামুটি ছাপ আমাদের তরুণ জীবনে থেকেই যায়। পরবর্তী জীবনে এই আবাসিক আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রেরণা আমাদের অনেকের জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এর স্বীকৃতি আমরা এই ষাট বছরে পেয়ে আসছি প্রাক্তন কৃতবিদ্য ও কৃতী বহু বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে। সুতরাং বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েই চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে আরও হবে, এই বিষয়ে আমরা বিশ্বাস করি।

গুরুগৃহ বাস প্রথায় শিক্ষা

স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের 'গুরুগৃহবাস প্রথার শিক্ষা'-কে পুনঃপ্রবর্তন করা। শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী। প্রদীপ দিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর মতো জীবন দিয়ে জীবনকে উদ্দীপিত করে তোলাই যথার্থ শিক্ষা। এই ষাট বছরে বিদ্যামন্দির স্বামীজীর এই ভাবনাকে যথার্থ রূপ দিতে পেরেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ, বহু কৃতী বিদ্যার্থী স্বীকার করেন স্বামী তেজসানন্দ জাতীয় সন্ন্যাসী এবং বহু আদর্শ গৃহী আচার্যের ব্যক্তিজীবন থেকেই তাঁরা মহত্তর এবং বৃহত্তর জীবনের প্রেরণা পেয়েছেন। অর্থ অর্জনের 'বিদ্যা' অনেকের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে— কিন্তু জীবনগঠনের কল্যাণকর প্রেরণার 'শিক্ষা' আদর্শ চরিত্রবান আচার্যদের কাছ থেকেই সম্ভব। আধুনিক 'মাস্টারমশায়' এবং তপোবনের 'গুরু'-র ধারণার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আধুনিককালের নাগরিক পরিবেশে ও বিদ্যামন্দিরের স্নেহশীল, বিদগ্ধ ও ছাত্রদরদী শিক্ষকদের মধ্যে— বিশেষত সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং ছাত্রাবাসের সন্ন্যাসী সুপারদের চরিত্রের একটি বিশেষ প্রভাব ছাত্রদের জীবনে থেকেই যায়।

সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা, মনঃসংযমের জন্য ধ্যানাদির অভ্যাস, সংস্কৃত প্রার্থনামন্ত্রাদির উচ্চারণ, বিশেষ বিশেষ উৎসবাদির দর্শন ও কর্মী হিসাবে অংশগ্রহণ, দেয়াল পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লেখা, পুরস্কারাদির জন্য প্রবন্ধ লেখা, আচার্য সন্ন্যাসী অ-সন্ন্যাসী গুরুজনদের প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন— ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক চর্যার মধ্যে একটা 'গুরুগৃহসদৃশ' আশ্রমিক ভাব

বিদ্যামন্দিরের পরিবেশে চিরজাগ্রত। এর প্রভাব পরবর্তী সমাজ ও কর্মজীবনে সুস্পষ্ট হয়। ইহা বিদ্যামন্দিরের একটি বিশেষ অবদান। এ প্রথার শিক্ষা আধুনিক সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গৃহীত।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চেতনায় একটা সমন্বয়ের ভাব ছিল। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বলেছেন— 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু'। আবার বলেছেন 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' এই উভয়ের সমন্বিত ভাবেই— অর্থাৎ অন্নচিন্তা এবং ঈশ্বরচিন্তার যুগপৎ সাধনার দ্বারাই ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবন সার্থক ও সুন্দর হবে। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের আদর্শ যুক্ত না থাকলে—ভোগকে সংযমের সাথে বাঁধতে না পারলে—ভোগ-সম্ভোগ দুর্ভোগেই পরিণত হয়। বর্তমান বিশ্বমানবের সম্মুখে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রচুর ভোগ্যপণ্য। কিন্তু এই ভোগ্যপণ্যের বণ্টন এবং সম্ভোগ 'আধ্যাত্মিক' ভাব-শাসিত নয় বলেই বিশ্বের যত অশান্তি। বিজ্ঞানের চর্চা মানবীয় বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রকাশ। একে দমিয়ে রাখা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রতিদিনই বিজ্ঞান নব নব আবিষ্কার করে চলেছে। গোটা বিশ্ব এখন 'একনীড়' হয়ে গেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন না থাকায় বিজ্ঞানের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্কতায় এবং অধ্যাত্মজ্ঞানে সমন্বিত চরিত্রের নাগরিক। আর, বিদ্যামন্দিরই এইজাতীয় চরিত্র গঠনের একটি প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যামন্দির এই ষাট বৎসরে স্বামীজীর কল্পনার এইজাতীয় বহু নাগরিক সৃষ্টি করেছে। অন্তত এই জাতীয় শিক্ষাদর্শের কথা— হাজার হাজার বিদ্যার্থীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ' করেছে। এবং বহু ভাগ্যবানের প্রাণকে আকুলও করেছে। বহু প্রাক্তন ছাত্রদের জ্ঞান-বিজ্ঞানদীপ্ত ত্যাগ ও সেবাময় জীবন এখন সমাজের আদর্শ এবং অনুকরণীয় হয়েছে।

গুরুসান্নিধ্যে পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা-র শিক্ষা

মানবজীবনের 'পুরুষার্থ'-হল ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। এই চতুর্বর্গের সমন্বিত শিক্ষাই হল পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা। বিদ্যামন্দির এই সমন্বিত শিক্ষার প্রেরণাই দিয়ে চলেছে। শুধু বৈষয়িক কৃতিত্বই নয়— বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থীর জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করার ব্যবস্থা আছে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষা পদ্ধতিতে। দেশের অন্যান্য কোনো কোনো বিদ্যালয় ও কলেজের পরীক্ষার ফল বিদ্যামন্দির-জাতীয় মিশন স্কুল, কলেজ অপেক্ষা ভালোও হয়। কিন্তু অন্য স্কুল-কলেজে জীবনদায়ী সমাজকল্যাণব্রতের প্রেরণাদায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা অতি অল্প।

স্বামীজীর সমসাময়িক বা কিছুকাল পরে এই জাতীয় আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ অনেকেই। স্বামীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাচিন্তার প্রবক্তাদের মধ্যে ত্যাগ ও 'পুরুষোচিত' গুণ থাকার ফলেই উহা ফলপ্রসূ হয়েছে।

'ফলেন পরিচীয়তে'

কোনো বৃক্ষের পরিচয় তার ফলের দ্বারা। বিদ্যামন্দিরবৃক্ষের পরিচয়ও হবে তার ফলস্বরূপ বিদ্যামন্দির বিদ্যার্থীর গুণের দ্বারাই। সমাজের সর্বস্তর থেকে বিচিত্র পারিবারিক সংস্কার নিয়ে আসে তরুণ বিদ্যার্থীগণ। বর্তমানে ছাত্রভর্তির মানদণ্ড মুখ্যত পূর্ববর্তী পরীক্ষার ভালো ফল — তার পর মেধা নির্বাচনের জন্য বিদ্যামন্দিরের নিজস্ব পরীক্ষা। আসনসংখ্যার তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বহুগুণ হওয়ায় এরূপ ছেঁকে, বিশেষ মেধার অধিকারীদেরই নিতে হয়। বহু যোগ্য এবং 'উত্তম আধার'কেও দুঃখের সঙ্গেই বিদ্যার্থীরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

মেধাবী বিদ্যার্থীরা, সুশৃঙ্খল পরিবেশে, বিদগ্ধ শিক্ষকদের পরিশ্রমে ও যত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে খুবই ভালো ফল করে। প্রতি বৎসরের পরীক্ষার ফল বেরোলেই দেখা যাবে বিদ্যামন্দির বা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত যে-কোনো স্কুল কলেজই ভালো ফল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ভালো ফল বিদ্যামন্দিরের পক্ষে বাহ্যত কৃতিত্বের অন্যতম নিদর্শন সন্দেহ নেই। কিন্তু "এহো বাহ্য"।

বিদ্যামন্দিরের কৃতিত্ব তার স্নাতকদের পরবর্তী সমাজজীবনচর্যায়

স্বামীজী বেলুড় মঠে আবাসিক বিদ্যালয়ে যে সকল যুবককে 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত' করতে চেয়েছিলেন, তাদের জীবনের প্রস্তুতি হবে 'ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে প্রচার কার্যের জন্য।' তিনি অবশ্য বলেছেন 'যুবক-সন্ন্যাসী'। সন্ন্যাসী শব্দটা গেরুয়াধারী-নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-ধারীদেরই মুখ্যত বুঝালেও ত্যাগভাবদীপ্ত, পরার্থপর ও সেবাপরায়ণ আদর্শ গৃহীদেরও বুঝায়। বিদ্যামন্দিরের বহু স্নাতক নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে 'আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিতের' ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। আবার তেমনি বহু গৃহী প্রাক্তন ছাত্র আছেন যাঁরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে এবং সংসারজীবনে ত্যাগ ও সেবায় আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছেন।

শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তম ফলের দ্বারা একটা মূল্যবান জীবিকার প্রস্তুতিই নয়, কর্মজীবনে এবং গার্হস্থ্যজীবনে সহজ সরল জীবনযাপন, সততা, কর্মনিষ্ঠা, পরার্থপরতা—আধ্যাত্মিকভাবে সমগ্র জীবনকে ভাবিত করে চলা প্রভৃতি সৎগুণের দ্বারাই অনেকে 'দেশে বিদেশে' একটা মহৎ উদার এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। বিদ্যামন্দিরের 'প্রাক্তন'-দের একটা বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত। বিদ্যামন্দির থেকেই তাঁদের এই বিশিষ্টতাটুকু অর্জিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই। পূর্বেই বলেছি— বিদ্যামন্দিরে ছাত্রজীবনে হয়তো, বিদ্যার্থীদের বিদ্যামন্দিরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা তেমন থাকে না, কিন্তু কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হলেই বাইরের সমাজজীবনের বিরুদ্ধ বাস্তব পরিবেশ দেখে বিদ্যামন্দিরের আদর্শের কথাগুলি মনে পড়ে এবং সেইভাবে জীবনচালনার প্রেরণা আসে।

প্রাক্তন-ছাত্রদের 'দায়'-বোধ সার্থকতার বিশেষ পরিচয়

বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবস্থায় না হলেও পরবর্তী জীবনে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের মধ্যে বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্য বহনের একটা 'দায়' বোধ বিশেষ লক্ষণীয়। স্বভাবত উচ্চ মেধার অধিকারী বিদ্যামন্দিরের স্নাতকেরা কর্মজীবনেও বেশ উচ্চ উচ্চ পদেই দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। প্রাক্তনরা অধ্যাপক, গবেষক, সমাজসেবক— ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কর্মক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা যেমন আদর্শনিষ্ঠ—'ত্যাগ ও সেবা'-ভাবে উদ্বুদ্ধ, তেমনি তাঁদের সহকর্মীদের মধ্যেও তাঁদের সদ্‌গুণের প্রভাব কার্যকর হয়ে চলেছে দেখে আমরা মুগ্ধ। স্বামীজী 'দেশে বিদেশে' যে আদর্শ জীবনের প্রচারক চেয়েছিলেন,— বিদ্যামন্দিরের স্নাতকদের অনেকেই সে আশা যথাসাধ্য পূর্ণ করে চলেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাঁদের আদর্শ জীবনবোধকে তাঁরা বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্যের 'দায়' বলেই মনে করেন। এখানেই বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্যের সার্থকতা। 'বিদ্যামন্দির' আমাদের দেশের শিক্ষাচেতনার একটি 'মডেল'। এর সর্বজনগ্রাহিতাই সার্থকতার পরিচায়ক।

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী-সংসদ

স্বামীজীর আদর্শ জীবনবোধকে 'ত্যাগ ও সেবার' মাধ্যমে ব্যক্তি ও

সমাজজীবনে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার জন্যই গড়ে উঠেছে 'বিদ্যামন্দির এলামনি অ্যাসোসিয়েশন'। এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, নীতিবোধ, সেবাবোধের প্রচার সাধ্যমতো চলছে। অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যামন্দিরের 'দায়' এবং ব্যক্তিগত জীবনের ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।

একদল সন্ন্যাসী প্রাক্তন

বিদ্যামন্দিরের বিশেষ অবদান হলেন একদল প্রাক্তন ছাত্র-সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এবং বিশ্বসমাজে এঁদের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনের প্রভাবে বহু জীবন 'দিব্য' হয়ে উঠেছে। প্রাক্তনী সংসদকে এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থী সেবাকর্মীকে তাঁরা প্রেরণা এবং উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু আদর্শ প্রাক্তনের সেবাপ্রকল্প

সংবাদপত্র, টিভি প্রভৃতির আলোকে না-আসা বহু ত্যাগভাবাপন্ন প্রাক্তন ডাক্তার, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক গ্রামে গঞ্জে বহু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, সমাজ-উন্নয়ন, বনসৃজন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি প্রকল্প প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যামন্দিরের ভাবপ্রচারের দায় বহন করে চলেছেন।

ষাট বৎসরের জীবনে—বাইরের প্রতিকূল চিন্তাধারার মধ্যেও বিদ্যামন্দির স্বামীজী-পরিকল্পিত মানুষের দিব্যভাবের প্রকাশে বিশেষ সার্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠান হবে বিদ্যার্থীগণের 'দায়' বহনের বিশেষ প্রেরণা।

টুকরো খবর

সাবাস সন্দীপ!

বিদ্যামন্দিরের ছাত্র শ্রীমান সন্দীপ জানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৮-এ গণিত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেছিল— সব মিলিয়ে পেয়েছিল ৮০ শতাংশের মত নম্বর। এরপর বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এসসি-তে ভর্তি হয়। এম. এসসি-তেও সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম— পেয়েছে সেই ৮০ শতাংশের মত নম্বর। প্রসঙ্গত, শ্রীমান সন্দীপ ১৯৯৮-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Edward Scholar; নানা গুণের অধিকারী, বিনম্র ও মেধাবী এই প্রাক্তনীর আরো সাফল্য আসুক, এই প্রার্থনা করি।

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এবারে হাওড়া জেলার আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করল বিদ্যামন্দির। জেলার ১৬টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যামন্দিরের খেলার মাঠ মাতিয়ে রাখল কয়েকদিন। ফুটবল প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্ট। রাজ্য-চ্যাম্পিয়ন শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশানের সঙ্গে ফুটবল প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছে।

দৃষ্টান্ত

বিদ্যামন্দিরে অনেক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র এবং কয়েকজন প্রতিবন্ধী ছাত্রও পড়াশুনা করে। তাদের জন্যে একটি বৃত্তি তহবিল তৈরির আবেদনে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিলেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকরা। দুই কিস্তিতে প্রাপ্য তাঁদের বকেয়া পাওনার তিন শতাংশ এই তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। যাঁরা সদ্য অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন এবং বকেয়া হিসেবে কোনো টাকাকড়ি পাননি, তাঁরাও এই উদ্যোগের অংশীদার হয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে অবসর নিয়েছেন, এমন অধ্যাপকরাও পিছিয়ে নেই। আশা করা যাচ্ছে এভাবে আড়াই লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করা সম্ভব হবে এবং দুটি ছাত্রের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করা যাবে।

দেশ জুড়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের দ্রুত অবনতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকদের এই উদ্যোগ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

স্বায়ত্বশাসন

বিদ্যামন্দির স্বশাসিত কলেজ হতে পারে— এমন কথা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ৭টি কলেজকে বাছা হয়েছে, বিদ্যামন্দির তার মধ্যে অন্যতম। এখন চলছে সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি খতিয়ে দেখার কাজ। হয়তো বিমুক্তানন্দজী-পরিকল্পিত "স্বামীজী বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের দিকে এভাবেই আমরা ধাপে ধাপে এগোতে থাকবো। সন্দেহ নেই, এই সম্ভাবনায় প্রাক্তনীরা খুবই উৎসাহিত।

আবেদন ১

ডাকমাশুল অনেক বেড়েছে। প্রাক্তনী সংসদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা তো আছেই। নানা সময়ে চিঠিপত্র, নোটিশ, প্রাক্তনীবার্তা ইত্যাদি ডাকে পাঠানো বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে "Not known" বা "Left" ছাপ নিয়ে অনেকের চিঠি ফেরত আসছে। আর্থিক অপচয়ের চেয়েও বড় কথা— আমরা আমাদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছি। তাই আমাদের আবেদন— আপনাদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে অনতিবিলম্বে আমাদের জানান।

আবেদন ২

স্বামী তেজসানন্দ রচনাসংগ্রহের অনেক গ্রাহকই এখনও তাঁদের প্রাপ্য কপি সংগ্রহ করেননি। এ বিষয়ে প্রাক্তনীবার্তায় আবেদন করা ছাড়াও তাঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে চিঠিও লেখা হয়েছে। কেউ কেউ তারপর রচনাসংগ্রহ নিয়ে গেলেও এখনও সংগ্রহ করেননি এমন সদস্যের সংখ্যা কম না। আপনাদের বই অবিলম্বে সংগ্রহ করে আমাদের সহায়তা করুন।

আবেদন ৩

৬০ বছরে বিদ্যামন্দির থেকে কত হাজার ছাত্র পাশ করে বেরিয়েছেন? সঠিক হিসেব জানা না থাকলেও আন্দাজ অবশ্যই করা যায়। ঘটনা হল— বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের সদস্যসংখ্যা মাত্র ৬৮০-র মতো। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আপনাদের পরিচিত প্রাক্তনীদের সংসদের সদস্য হতে উৎসাহিত করুন। নাম-ঠিকানা জানালে আমরাই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেব তাঁদের কাছে।

বিদ্যামন্দির সমাচার

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরটি বিদ্যামন্দিরের জীবনে যথারীতি ঘটনাবহুল। আবাসিক জীবনের বহুধাবিস্তৃত কর্মধারা বিদ্যামন্দিরকে সর্বদা প্রাণচঞ্চল করে রাখে। অতিসংক্ষেপে তার রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক।

উৎসব অনুষ্ঠান : বিদ্যামন্দিরের জীবনে উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, ছাত্রদিবস, জাতীয় যুবদিবস, সরস্বতী পুজো, বর্ষবরণ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী, প্রতিষ্ঠা দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভ্রাতৃবরণ, শারদোৎসব, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী— আরো অনেক অনুষ্ঠানে বিদ্যামন্দির সারা বছর জমজমাট। এবারে ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল দ্বিবার্ষিক শিক্ষাপ্রদর্শনী। সব মিলিয়ে ১৭টি বিষয়ের উপর চার্ট, মডেল ইত্যাদি প্রদর্শনীকে বর্ণময় ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রণজিৎকুমার চক্রবর্তী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রাক্তন ফুটবলার প্রদ্যোৎ বর্মন এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার তপনজ্যোতি ব্যানার্জি। ১১ মার্চ ২০০০-এ আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আশিসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউ. জি. সি. পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের যুগ্মসচিব ড. সুতনু ভট্টাচার্য। এবারে বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রধান— বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধীক্ষক এবং অধ্যাপক স্বামী তথাগতানন্দজী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রাক্-পূজা শারদোৎসবে বেশ কয়েক বছর বাদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমবেত যোগদানে অধ্যাপক মৃণালকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল একটি নাটক। ছাত্রদের এবং হস্টেলকর্মীদের নাটক তো আছেই।

আলোচ্য বছরে 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছে—একটি নয়, দু দু'টি। আসলে সময়ের ফাঁকটা একটু বেড়ে যাচ্ছিল; সেটাকে কিছুটা ভরিয়ে নিতেই এক ক্যালেন্ডার বর্ষে দুটি পত্রিকার প্রকাশনা। ছাত্র-শিক্ষককর্মী ও কর্তৃপক্ষের সমবেত প্রচেষ্টায় বিদ্যামন্দির পত্রিকা তার চিরাচরিত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। পত্রিকার গুণমান বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত।

বিদায় সংবর্ধনা : ২০০০-এ বিদ্যামন্দির সশ্রদ্ধ অবসরকালীন বিদায় সম্বর্ধনা জানাল দীর্ঘদিনের কয়েকজন যাত্রাসঙ্গীকে। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে অবসর নিলেন অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্য। দীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— ৩১ জানুয়ারি ২০০০-এ আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনা সভায় বিদ্যামন্দির তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রাকটর উষারঞ্জন সেনগুপ্ত অবসর নিলেন ৩১ মার্চ তারিখে। ওই দিনে আয়োজিত সভায় বিদ্যামন্দিরের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এই নীরব শিক্ষাসেবকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে সংযুক্ত রাখার পর ১ জুলাই তারিখে অবসর নিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পিনাকীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। বিদ্যামন্দিরের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা স্মরণ করে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় ওই দিনে আয়োজিত এক বিদায় সংবর্ধনা সভায়। আরো একজন চলে গেলেন বিদ্যামন্দির ছেড়ে— গণিত বিভাগের প্রধান— অধ্যাপক শচীন্দ্রকুমার বক্সি। আইনের চোখে বছর তিনেক আগে অবসর হলেও নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছিলেন অবৈতনিক ভিত্তিতে। এবারে পাকাপাকিভাবে বেলুড়ের পাট তুলে কলকাতাবাসী হলেন তিনি। ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে এক অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক আয়োজনে স্টাফ-রুমে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হল গণিত বিভাগের এই প্রধান স্থপতিকে।

বিদ্যামন্দির ছেড়ে অন্যতর দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন স্বামী শেখরানন্দ— সবার প্রিয় সত্যব্রত মহারাজ। দু বছর ট্রেনিং সেন্টার আর মাত্র কয়েকমাসের অরুণাচল যাওয়া বাদ দিলে বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর সংযোগ প্রায় দুই যুগের। সদাপ্রসন্ন, নিরভিমান, ক্রীড়ামোদী এই সহকর্মীকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল ১৬ মে তারিখে। আশা করা যায় মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের দায়িত্ব তিনি যথাযথ দক্ষতায় সামলাবেন।

চিরবিদায় : চিরকালের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন একজন— স্বামী কালিকাত্মানন্দজী— ছেলেদের প্রিয় 'দাদু' মহারাজ। শরীর ভালো যাচ্ছিল না অনেক দিন। হস্টেল অফিসের দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি

দেওয়া হয়েছিল বর্তমান শিক্ষাবর্ষের গোড়া থেকেই। অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন এবং ধীরে ধীরে চরম পরিণতির দিকে এগোচ্ছিলেন। অবশেষে ২৭ জুলাই তারিখে জানা গেল তিনি আর নেই। শোকস্তব্ধ বিদ্যামন্দির রামাকৃষ্ণলোকে চিরবিদায় জানাল এই প্রধান, স্নেহশীল, দীর্ঘদিনের সহযাত্রীকে।

সুস্বাগতম : এ বছরে বিদ্যামন্দিরে শূন্যস্থান পূরণের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এলেন অনেকেই। দর্শন বিভাগে বছরের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক শামিম আহমেদ। ২২ জানুয়ারি থেকে তাঁর বিভাগীয় সহকর্মী হলেন অধ্যাপক ফরিদ-উর-রহমান। ব্র: জনার্দনচৈতন্য (সঞ্জীব মহারাজ) যোগ দিলেন ২১ মার্চ থেকে। প্রসঙ্গত তিনি বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী (৮৬-৮৮)। তাঁর যোগদানে বাংলা বিভাগ বিশেষ উপকৃত হল। তাঁর বহুমুখী উৎসাহ বিদ্যামন্দিরের সামগ্রিক কর্মে গতি আনবে, এই প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। ব্র: দেবাঞ্জন মহারাজ যোগ দিলেন অগস্টের গোড়ার দিকে। নরেন্দ্রপুরের এই প্রাক্তনী অর্থনীতি বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপনা করবেন— সামলাবেন হস্টেলের দায়িত্বও।

২৬ এপ্রিল থেকে চারজন শিক্ষাকর্মী বিদ্যামন্দিরে যোগ দিলেন— হারাধন সাধুখাঁ লাইব্রেরি ক্লার্ক হিসেবে, দেবব্রত মণ্ডল অফিস ক্লার্ক হিসেবে, পিন্টু বেরা মালি হিসেবে এবং তাপস মণ্ডল হস্টেল কর্মী হিসেবে। তাঁরা সরকারি অনুমোদন পেলেন— দেবব্রত মণ্ডল ছাড়া অন্য সকলেই দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেন অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র পাল। দীর্ঘদিন বার্সারের গুরু দায়িত্ব সামলে এবারে অব্যাহতি পেলেন অধ্যাপক স্বপনকুমার চক্রবর্তী। দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ধাড়া।

সেমিনার : সভা : ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার Institute of Preventive Awareness-এর পক্ষ থেকে সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ মণ্ডল ছাত্রদের কাছে Health Awareness বিষয়ে বললেন। ৮ এপ্রিল তারিখে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী ছাত্রদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল—"স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী ও আজকের যুবসমাজ।" নবীনের জিজ্ঞাসা মেটাতে প্রবীণের আন্তরিক প্রচেষ্টা আলোচনা সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ১৫ এপ্রিল তারিখে সাপ্তাহিক সেমিনার সভায় "পঞ্চায়েতি রাজ ও জন-অংশগ্রহণ" বিষয়ে আলোচনা করল একাদশ শ্রেণীর ছাত্রেরা। ১৯ অগস্ট তারিখে "মহাবিশ্বের রহস্য" বিষয়ে এক আকর্ষণীয় আলোচনা করলেন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের প্রফেসর ও সিনিয়র সাইন্টিস্ট অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ সেপ্টেম্বর তারিখে সাপ্তাহিক সেমিনারে বললেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে বললেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী সেমিনার— ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীশ্রীঠাকুর-মা এবং স্বামীজীর বিষয়ে।

প্রাক্তনী সংসদের আয়োজনে প্রথম "রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা" আয়োজিত হল ১৫ অগস্ট তারিখে। প্রাক্তনী তারাপদ দাস মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এখন থেকে প্রতি বছর এই বক্তৃতা হবে। এবারে এই বক্তৃতা দিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর ট্রাস্টের সম্পাদক কুশল চৌধুরী। ১৮ ডিসেম্বর তারিখে "স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা" দিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—"ভারতীয় ললিতকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন।" এবার থেকেই বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ এই বক্তৃতা আয়োজনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পেল। ২ ডিসেম্বর তারিখে অম্বিকা সরকার ও যদুনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল। 'স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা' বিষয়ে বললেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ-এর সাধারণ সম্পাদক ব্র: মুরাল ভাই। "মানব মস্তিষ্কের কার্যকলাপ অনুধাবনে পদার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা" নিয়ে ৪ নভেম্বর তারিখে বললেন বিদ্যামন্দিরের কৃতী প্রাক্তনী সাহা ইন্সটিটিউট-এর অধ্যাপক কমলেশ ভৌমিক।

পরীক্ষার ফলাফল : পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে বিদ্যামন্দির তার সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে। নীচে সংক্ষেপে এ বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হল :

১. উচ্চ-মাধ্যমিক (২০০০)

বিজ্ঞান বিভাগ

মোট পরীক্ষার্থী : ৬১ জন

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ : ৫৫ জন

৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে : ৩০ জন

৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে : ৪২ জন

সর্বোচ্চ নম্বর : ৯২.৬০%

কলাবিভাগ

মোট পরীক্ষার্থী : ২১ জন

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ : ১৭ জন

সর্বোচ্চ নম্বর : ৭৩.৮০%

২. বি. এ/বি. এস. সি পার্ট টু :

বিষয়	পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু মিলিয়ে প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	অনুত্তীর্ণ/ পরীক্ষা দেয়নি	মোট
ক. পদার্থবিদ্যা	২০	৭	×	২৭
খ. রসায়ন	১৮	৪	×	২২
গ. গণিত	১	১৩	১	১৫
ঘ. অর্থনীতি	×	১০	৩	১৩
ঙ. ইংরেজি	×	৭	২	৯
চ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান	×	৪	×	৪
ছ. ইতিহাস	×	৪	×	৪
জ. দর্শন	×	৫	×	৫
মোট	৩৯	৫৪	৬	৯৯

বিজ্ঞান বিভাগে মোট ৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে ৩৯ জন। ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কও যথেষ্ট সন্তোষজনক। পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও বিংশতিতম (দু'জন) স্থান; রসায়নে তৃতীয়, দ্বাদশ, উনবিংশ এবং বিংশতিতম স্থান, এবং গণিতে একবিংশতিতম স্থান পেয়েছে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা।

৩. বি. এ./বি. এস সি. পার্ট ওয়ান

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিগত ৩০ নভেম্বর তারিখে ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। যথারীতি, বিদ্যামন্দিরের সাফল্যের ধারা অব্যাহত। নীচে সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হল :

বিষয়	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	অনুত্তীর্ণ/ অনুপস্থিত	মোট	সর্বোচ্চ
১. পদার্থবিদ্যা	১৭	×	১ (অনুপস্থিত)	১৮	৮৩·২৫%
২. রসায়ন	১১	৮	১ (")	২০	৭৫%
৩. গণিত	৪	১২	২ (অনুত্তীর্ণ)	১৮	৭৮%
৪. অর্থনীতি	×	৯	২ (অনুপস্থিত)	১১	৫৯·৭৫%
৫. ইংরেজি	×	২	১ (ফল অপ্রকাশিত)	৩	৪৬·২৫%
৬. দর্শন	×	১	১ (অনুত্তীর্ণ)	২	৫৪%
৭. ইতিহাস	×	৬	×	৬	৫৭%
৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞান	×	৬	×	৬	৫১%
৯. সংস্কৃত	২	১	×	৩	৬৪%
মোট	৩৪	৪৫	৮	৮৭	

যতদূর খবর পাওয়া গেছে— পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেছে বিদ্যামন্দিরেরই ছাত্র।

এইভাবে আপন সাফল্যের ধারাকে বহন করে বিদ্যামন্দির এগিয়ে চলেছে স্বামীজীর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে।

প্রাক্তনীবার্তা বিষয়ক যোগাযোগ

গৌতম গোস্বামী
পি-৭৮ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৮৪
ফোন : ৪৩০-০০৬০

কমলেশ মণ্ডল
২/২ গাবতলা লেন, বেহালা, কলকাতা ৭০০ ০৬০
ফোন : ৪৭৮-৮৪১৭

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ (বেলুড়মঠ) কর্তৃক প্রকাশিত

স্বামী তেজসানন্দ রচনাসংগ্রহ

(Collected Works Of Swami Tejasananda)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম কলেজ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাসংগঠক, ও চিন্তাবিদ স্বামী তেজসানন্দজীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর নির্বাচিত সংকলন।)

এতে আছে :

ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় স্বামী তেজসানন্দজীর একটি প্রামাণ্য জীবনী

- স্বামী তেজসানন্দজী সম্পর্কে নানাজনের স্মৃতিচারণ
- নির্বাচিত পত্রাবলী
- কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র
- স্বামী তেজসানন্দজী কর্তৃক লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থের তালিকা
- ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লেখা পঞ্চাশটিরও বেশি প্রবন্ধ

মহাজীবন ও বাণী, ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন, শিক্ষাচিন্তা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন, স্বদেশ চেতনা ও নবজাগরণ, বিশ্বশান্তি ও ধর্মসমন্বয়— এই ছয়টি শিরোনামে প্রবন্ধাবলী সংকলিত হয়েছে।

সংগ্রহ মূল্য ১৫০.০০

প্রকাশক : অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ, কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ।

মুদ্রক : সৌমেন সিন্ডিকেট, বালি, হাওড়া।

প্রাপ্তিস্থান :

(১) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ

(২) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বেলুড়)-এর বিক্রয়কেন্দ্র

(৩) ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচার

(৪) ডঃ বিশ্বনাথ দাস, রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

(৫) উদ্বোধন, কলকাতা

(৬) অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা।

সৃষ্টি: আত্মপরিচয় ও আলোচকের চোখে

নলিনী বেরা

[২৬ জুলাই ২০০০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কারে প্রদত্ত ভাষণ]

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীদিব্যেন্দু পালিত, নাট্যকার ও পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আখ্যান-সমালোচক ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী রুশতী সেন, প্রাবন্ধিক ও পশ্চিমঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত গুণীজন।

সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কারে আমার গল্প সংকলন 'পরিক্রমা'-কে সম্মানিত করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। একজন লেখকের কাছে সোমেন চন্দ নামটি প্রতীকের মতো যেখানে শরীরের রক্ত আর কলমের কালি মিলেমিশে একাকার। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সোমেন চন্দ পুরস্কারের মাধ্যমে একজন শিক্ষানবীশ আখ্যানকারকে তাঁর দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন।

নিজের লেখালেখি নিয়ে আমার বলার মতো কিছুই নেই। যা লিখি তার দাম হয়ত কানাকড়ি কিন্তু ওই কড়িটিকেও কাগজ-কলমের মাধ্যম ছাড়া দেখতে পাই না। কী লিখব তা যদি জানি তাহলে তো লেখারই দরকার হয় না, সংরক্ষণের বহু সহজলভ্য মাধ্যম যেখানে হাতের কাছেই আছে। লেখার পরেও বুঝে উঠতে পারি না সত্যিই কী লিখেছি। পাঁচজনের পাঁচকথায় লেখার মানে তৈরি হয়। সেখানে আমি বে-গাঁয়ের মানুষ।

নিজের লেখা নিয়ে বলতে আমার অন্য এক অসুবিধেও আছে। আমি গাঁয়ের ছেলে ফলে ব্যক্তির একককে সেভাবে বুঝে উঠতে পারিনি কখনো। দু-তিন বছর পরে কোনো আত্মীয়স্বজন বা পাড়াপড়শি ঘরে এলে চারপাশ জরিপ করে বলতো— 'ও মা, শ্যামলিকে বগ্না দেখে গেলুম ওর আবার বাছুর হয়েছে? সজনে গাছটা সে বছর লাগালে, এর যে ডাঁটা ঝুলছে গো! কালো হাঁসছানাটা ডিম দিচ্ছে? এটা তোমার ছোটছেলেটা না? কাছে আয় বাপ। তুই যে পুয়োল ছাতুর মতো দিনে বাড়িস রাতে বাড়িস!' গরু, হাঁস, সজনে গাছের সঙ্গে পা মিলিয়ে যে বেড়ে ওঠা তা থেকে আমি আমাকে আলাদা করি কেমন করে?

গাঁয়ে যেমন হয় ফি বছরে গোবরের গোলা দিয়ে বাড়ি বাঁধা হোত। সে বেড়িতে ভূত-পেত্নি আটকা পড়তো কিন্তু একদিনের বাছুর, দু-দিনের ছাগলছানা কিংবা চার বছরের সাবালক ছেলেকে বাঁধা যেত না। এক শ্বাসের 'কু' ডাকে যে-কেউ বাড়ি ছেড়ে মরামের লাল রাস্তায়। ক্ষেতমজুর কিষ্ট মেটের গোবর-সারের গাড়িতে চেপে দূরের মাঠে গড়িয়েছি, কাঁধে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে গেছি ভিন গাঁয়ে। কিষ্ট কাকার হাতের কাজ ছিল দেখার মতো। আঙুলের মুদ্রায় এমন সর্ষে ছড়াতো যে সর্ষেফুল ফোটার পর হলুদ রঙে এতটুকু মাকুচোরা থাকত না। আখের পাতায় এমন বেণী বাঁধতো যা দেখে মেয়েরাও হিংসে করতো। আমাদের জেলা এমনিই জলের কাঙাল তার ওপর দু-দুটো বর্ষা শুকনো গেল। চাতকের দিনভর ডাকেও মাটি ভিজল না। ক্ষেতমজুরদের কাজ দেবে কে? এক বিকেলে দেখি ডাকাতির অভিযোগে কোমরে দড়ি বেঁধে কিষ্ট মেটেকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। খুনের কারণে তার সাত-আট বছর জেল হয়। তার বেশ কিছু বছর পরে, এখন থেকে বছর সাতেক আগে, নিছক উৎসাহে একটা মামলার শুনানি শুনতে কোর্টে যাই। সেখানেও এক ডাকাতির আসামি। দেখি জজ-উকিলরা তিনশ চারশ, পাঁচশ— এমন নানা ধারার কথা বলছে। মনে পড়ে গিয়েছিল কিষ্ট মেটের কথা। তাকেও নিশ্চয় শুনতে হয়েছিল আইনের নানা ধারা-উপধারার কথা। শুনে কী বুঝেছিল, কী ভেবেছিল সে? জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি কারণ ততদিনে কিষ্টকাকা মারা গেছে।

প্রাইমারি ইস্কুলে আমার থেকে দু-শ্রেণী ওপরে পড়ত ফটিক হাঁড়ি। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর ভাদ্রের গেরোটা আর পেরতে পারেনি। টাকায় আড়াই-পো চাল, তার ওপর সের-কোনার তলায় গোবরের প্রলেপ। ফটিক ইস্কুল ছাড়ল। তারপরেও বন্ধুত্ব ছিল। সুষেণ আর আমাকে ফটিক রণ-পা চড়া শেখাতে চেয়েছিল। সুষেণ এখন বাস-রাস্তার গায়ে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে। রণ-পায়ের প্রথম দেড়হাতের ধাপটায় চড়ে হাঁটতে শিখেছিলুম। চারপাশটা বদলে গিয়েছিল চোখের সামনে। পৃথিবীতে আছি অথচ পৃথিবীতে নেই। অনেকটা রাধা বোষ্টমীর 'সিনান করিবো তবু গা ভিজাবো না'-র মতো। রণ-পায়ের পরের আড়াই হাতে হাঁটতে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এল সুষেণ। হাঁটু ফুলে ঢোল। আমারও শিক্ষার শেষ। তার বেশ ক-বছর পরে চুরির দায়ে ধরা পড়ে ফটিক। থানায় ছোটবাবুর মারে তার ডান-হাতটা ভেঙে যায়। আর কটা ভাদ্রের গেরো পেরতে পারলে ফটিক হয়তো ছোট দারোগা হত। আর ছোট দারোগা যদি ভাদ্রে আটকে যেতো আমাদের উর্দি পরে আসামী ছোট দারোগার ডান হাতটা ভেঙে দিত। ফটিক, তারও বেশ কবছর পরে, হার ছিনতাইয়ের এক ঘটনায় জনতার হাতে মারা যায়।

ছয়ের দশকের শেষ থেকে আমাদের গাঁয়ের রঙ

গেল বদ্‌লে, কথা গেল পাল্টে পি, ডবলিউ ডি-এর পিচ দিয়ে দেওয়ালে লেখা হল— লাঙল যার জমি তার। যে সনাতন দে মনসার ভাসান গাইতো সে সুরটাকে ধরে রেখে জমির কথা ঢুকিয়ে দিল তার গানে। সনাতন-দার হাতে গোখরো সাপের খেলা দেখতেই অভ্যস্ত ছিলুম আমরা। এক বিকেলে দেখি জোতদারের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে সে বিষ্টুপুর থানায় যাচ্ছে। দেড় বছর জেল হয় তার। পাশের গাঁ পাঁচপেখের ভাগচাষী গেঁড়ার জমির মামলা গড়াতে গড়াতে কলকাতার হাইকোর্টে গেল। বিষ্টুপুর কোর্টের রবি মুক্তার চুরির আসামির কেস নিলে ফরিয়াদির জেল হয় এমন একটা কথা চালু দিল পাঁচ গাঁয়ে। সেই রবি মুক্তারের হাত থেকে পাঁচপেখের জমির মামলা হাইকোর্টে গেলে ভগবানের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। শীতের এক বিকেলে দেখি পাশের গাঁয়ের কালীসাধক হাঁড়ু চক্রবর্তী লাল রাস্তা ধরে ছুটছে। গলা তুলে ডাকলুম— 'কাকা, কী ব্যাপার? যাও কোথা?' হাঁড়ু-কাকা বললে— 'তাড়া আছে রে বাপ্। মিছিলটা ধরতে হবে।' দেখি রাস্তার বেড়ার গা থেকে একটা বাঁশ উপড়ে তার মাথায় গায়ের লাল কাপড়টা আটকে ছোটা দিল। হাঁড়ু কাকার পায়ের ছিয়ে খুব লম্বা, ধরতে পারিনি। কিন্তু শীতের হাওয়ায় উড়ন্ত চাদরের লাল রঙটা দেখতে পেয়েছিলুম অনেকদূর পর্যন্ত।

আমি গল্পের পোকা। পাড়াতুতো দিবাকরের পিসির কয়েকশ পাকা চুল তুলে দিয়েছি গল্পের লোভে। দুর্গা মণ্ডপে কাঁথা সেলাই করতে করতে পিসি রাজপুত্র রাজকন্যের গল্প বলতো। রাজপুত্রের জন্যে মণ্ডা-মিঠাই সাজিয়ে দিয়ে পিসি কপাল চাপড়াতো পিসেমশায়ের কথা বলে। পিসেমশাই বেঁচে থাকতে প্রতি হাটে একসের রসগোল্লা নিয়ে ঘরে ঢুকতো। রাজকন্যের মাছের মুড়ো খাওয়ার কথার সঙ্গে পিসি জুড়ে দিত তার এয়োতি কালের কথা। তখন ছোড়দি-পুকুরের মাছগুলো সব দশ-বার সের। মুড়োগুলো দেড়-দু সেরের ওপর। বিধবা হওয়ার পর পিসি আর মাছ খায় না। রাক্ষসপুরী থেকে মুক্ত হয়ে রাজকন্যে মাছের মুড়ো খায় রাজপুত্রের ঘরে।

মায়ের মুখে শুনেছি অনেক ব্রতকথা। সেগুলো বেশ লম্বা ছিল। পরে ছাপার অক্ষরে বেশ কিছু ব্রতকথা পড়ি। বেশ ছোট। পড়তেও তেমন ভাল লাগেনি। ষষ্ঠীর ব্রতকথার ভেতর মায়ের কাক তাড়ানো, মঙ্গলা ছুতোরনির সঙ্গে চিঁড়ের হিসেব করা, দখি জেলের মাছের ওজন দেখা— কতকিছুই ছিল। ওগুলো না থাকায় ছাপা ব্রতকথাগুলোকে বড় ন্যাড়া লাগে।

টেলু চক্রবর্তী রামায়ণ গান করতো, এখনও করে। চামরের দোলায় অযোধ্যার সুখ আর অশোককাননের দুঃখ ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। এর মাঝেই দুয়ারীদের হাতে সুর ছেড়ে দিয়ে চা-বিড়ি খেতে যায়, প্রণামীর চাল কম হলে মুখ খারাপ করে। তারপর মুখে জল ছিটিয়ে আবার আসরে ফেরে। তখন সীতার দুঃখে মানুষজনের বুক ফাটে।

কিষ্ট মেটে, ফটিক হাঁড়ি, হাঁড়ু চক্রবর্তী, দিবাকরের পিসি, আমার মা, টেলু চক্রবর্তী— এরকম আমার অনেক গুরু। নিজের বলতে কলম আর কাগজ। তার দাম আর ক-টাকা?

এক পরিক্রমা অনেক গল্প— রুশতী সেন

[সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ]

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় গল্পসংকলনের ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> আমার বেড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে। তুষুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব এবং কিশোরের জগৎ। অষ্টম কিংবা চব্বিশ প্রহরের কীর্তনের ধুলোটির যে গ্রাম পরিক্রমা তাতে গোরা হয়ে কতবার 'নগরভ্রমণ' করেছি।
>
> কৈশোরের ওই পর্বে, যাটের দশকে, ভাগচাষী ও কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধেছে। ক্ষেতে খামারে সংঘর্ষ, পুলিশের আনাগোনা। গোরার 'নগরভ্রমণের' পাশাপাশি প্রায় নিত্যদিনের রাজনৈতিক মিছিল। বৈষ্ণবীয় খোল আর রাজনৈতিক মাদল দুটোরই গ্রাম পরিক্রমা চলে। বাদ্যযন্ত্রের বোলের টান এবং কৈশোরের কৌতূহলী আবেগ আমাকে দু মিছিলেই হাঁটিয়েছে।
>
> (রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৪)।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৃজনকে বুঝবার জন্য লেখকের এই আত্মকথাটুকু একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিজের যে স্ববিরোধকে, টানাপোড়েনকে লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ ঋজু বিন্যাসে এখানে গ্রথিত করেছেন, তাকে পাঠক বারবার খুঁজে পান রামকুমারের সাহিত্যনির্মাণে, তাঁর ভাষার ভাঙাগড়ায়, তাঁর বিষয়ের গ্রহণে-বর্জনে। এই নির্মাণের সূত্রে অনুপুঙ্খের বিস্তারে লেখকের যে মনোযোগ, তা কখনো সমগ্রের সাম্যতায় ব্যাহত হয়নি। বাল্যকৈশোরের গেঁলিয়া গ্রাম তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। তাঁর ছোটোগল্পের শতকরা আশিভাগই বাঁকুড়ার জীবনে নিজের ভাষা আর বিষয় খোঁজে। বৈষ্ণবীয় খোল আর রাজনৈতিক মাদলের দোলাচল রামকুমারের বেলুড়-কলকাতা-হায়দ্রাবাদের শিক্ষাজীবন ব্যেপে, পুরুলিয়া-নরেন্দ্রপুর-কলকাতার কর্মজীবনের ছত্রে ছত্রে জটিল থেকে আরো জটিল হয়েছে। শিক্ষিত স্বাধীন আধুনিক বাঙালির এই অগ্রগমনের বাঁকে বাঁকে রামকুমারের নিত্যসঙ্গী থাকে তাঁর শৈশবের গাঁয়ে ফিরে ফিরে যাওয়া; অথচ এই পিছুটান রামকুমারের সাহিত্যকে এখনো আধুনিকের কোনো পরিত্রাণের উপমায় অথবা কোনো নিজবাসের ইচ্ছাপূরণে আচ্ছন্ন করেনি। পরবাসীর যন্ত্রণাই সম্ভবত লেখককে তাঁর নিজের ইতিহাস নিয়ে, সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক আবর্ত নিয়ে সাহিত্য বানানোর উপযুক্ত ভাষাটির হদিস দিয়েছে।

এভাষা রূপকথায় আড়াল করে চরম অ-রূপকথাকে, মর্মান্তিক বাস্তবগাথার স্বরূপকে বাস্তবসম্মত গড়নে মূর্ত করবার পক্ষে স্বাভাবিক এবং সংগত। এমন ভাষার অর্জনে তুষুগান-বাউল-রামায়ণ-কীর্তনের কাছে যেমন অপরিশোধ্য ঋণ থাকে, তেমনি সেখানে মিশে থাকে কলকাতা কি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের, হায়দ্রাবাদের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অভ্ ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন

ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর অভিজ্ঞতা। এ যৌথতার অসংগতি যে কতখানি অনিবার্য, তা রামকুমারের অজানা নয়। অজানা নয় বলেই *রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প* সংকলনটি শেষ হয় 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' নামের একটি বিশিষ্ট আখ্যানের বিন্যাসে (পৃ ১১৬-২৮)। প্রথম গল্পসংকলন *মাদলে নতুন বোল*-এর (আবহমান, নরেন্দ্রপুর ২৪ পরগণা, ১৯৮৪) জমানা থেকেই বোধকরি শিক্ষিত-বাঙালির আপাতসফল জীবন-জীবিকার অসহায় অসরল স্ববিরোধ রামকুমারের সাহিত্যিক অন্বিষ্টে নিহিত ছিল। বাস্তববাদী গল্প বুনবার সাবেকি ধরতাইতে সত্যের যতটুকু বিন্যাস সম্ভব, তার একটা সুঠাম পরিণাম লেখক তাঁর প্রথম দুটি গল্পসংকলন জুড়ে আয়ত্ত করেছেন।

রামকুমারের তৃতীয় গল্পসংকলন *পরিক্রমা*-য় (এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ১৯৯৯) পাঠকের অভিজ্ঞতা যেন কিছুটা আলাদা। এবারে যেন লেখক তাঁর এতদিনের সব গল্পকে ভেঙে ফেলছেন। তেমন ভাঙনের প্রয়োজন রামকুমারের সমকালীন সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির নিয়ম-বেনিয়মের প্রতিকূলতা থেকেই তৈরি হয়েছে। গল্পের বাস্তবে নয়, গল্পহীনতার মধ্যেই বুঝি গল্পকার এখন তাঁর আস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী। *পরিক্রমার* কাহিনীগুলি রচনার প্রায় সমসময়েই রামকুমারের উপন্যাসচর্চা *চারণে প্রান্তরের* (উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩) সূচনাপর্ব থেকে বেশ খানিকটা তফাতে *ভাঙা নীড়ের ডানায়* (অভিজাত প্রকাশনী, ১৯৯৬) দিশা চৌধুরীর গবেষণা আর মানবতার ঘাত-প্রতিঘাতকে পরম মমতায় বহন করছে; অথবা *মিছিলের পরে* (মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪ ব.) উপন্যাসের রাতের জনহীন অন্য ব্রিগেড কোনো এক বধিরতায় ভর করে শুনতে পেয়েছে মিছিলে এসে একা হয়ে যাওয়া পাঁচ-পাঁচটা মানুষের সঙ্গে গাছ গাছালির, পাখপাখালির, আকাশ-মাটির খোশগল্প, সুখ-দুঃখের বিনিময়। যেন 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' এর কার্যকারণকে আরো যথার্থ বুঝে নিতে হবে, দেশের ইতিহাসকে, ইতিহাস আর সাম্প্রতিকের পরম্পরাকে, যে পরম্পরার অসংগতিকে তল করতে হবে নতুন আঙ্গিকে, নতুন গদ্যভাষায়।

মিছিলের পরের মতো একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাস, আর "পরিক্রমা"র মতো এক আমূল সামাজিক ছোটোগল্প আসলে একই ইতিহাসের গল্পহীন সত্যিকে ব্যক্ত করে। অনুপুঙ্খের এক বিস্তারে 'মিছিলের পরে'র সূর্য সাঁই, কৃষিবিপ্লবের শহুরে কাণ্ডারীদের গ্রাম পার করে দেওয়া সূর্য সাঁই আজও সুতানুটির মাঠপাহারাদার বদন হাজরার উত্তরাধিকারী। যে বদন হাজরা সাহেবের বিপুল জলযান দেখে হাতের লাঠি নামিয়ে রেখেছিল ডাঙায়। সূর্য সাঁইয়ের আত্মকথার অছিলায় রামকুমার আসলে নিজেদের সাম্প্রতিক সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকে বিন্যস্ত করেন। সে সংকটে ইতিহাসের অনিবার্য দায়কে শনাক্ত করেন। এই সংকট, এই নিরালম্ব নিজবাসবিহীন অবস্থান, এই মর্মান্তিক দেশহীনতাই কি মূর্ত হয় না 'পরিক্রমা' কাহিনীতে— শতবর্ষ অতিক্রান্ত বৃদ্ধার উত্তরপুরুষদের সাফল্যমণ্ডিত, আলোকিত অথচ নিরুদ্দেশ পথযাত্রায়?

আসলে রামকুমার উপন্যাস-ছোটোগল্পের ভেদরেখাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। তিনি যেন একটি আখ্যানই বারবার বলেন। অথচ সে বলায় কোনো পুনরুক্তি থাকে না। নিজের দেশের ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমর্পণ করেন। তাই বইমেলার আগুন থেকে যে 'পেঁচা'র গল্প (*পরিক্রমা*, পৃ. ১২২-২৭) ডানা মেলে, তার অন্তরেও হাহাকার করে পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি। বাংলার দেশজ আখ্যানকাব্যের চর্চায়, বাংলার দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণে উপনিবেশের ভূমিকা আর তেমন ভূমিকার সংকট-সংকল্প বিন্যস্ত হয় 'পশ্চিম-পূর্ব'র (*পরিক্রমা*, পৃ ১০২-১৪) মতো আপাতসরল এক গল্পে; আদতে সে গল্প বাঙালির ইতিহাসের এক জটিলতম অধ্যায়কে স্পর্শ করতেই আগ্রহী। পাশাপাশি *পরিক্রমা* গল্পগ্রন্থের রচয়িতা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক' খণ্ডের পুনর্কথনে আর পুনর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করেছেন। 'লহনা-খুল্লনা', 'লহনা-খুল্লনা আখ্যান' অথবা 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'য় পাঠক দেখেন আখ্যানকার নিজেকে আড়াল থেকে আরো আড়ালে নিয়ে চলেছেন। রামকুমারের এই প্রকল্প এখনো অসম্পূর্ণ এবং অগ্রন্থিত। আবার *পরিক্রমা* সংকলনের সর্বশেষ কাহিনী 'কাবাডি-কাবাডি'র (*পরিক্রমা*, পৃ ১২৮-৩৯) তির্যক সরবতা এক বছরের অবসরে *ধ্বংসস্তূপ* উপন্যাসে নিজের পরিণত অবয়ব শনাক্ত করতে চায়। ওই উপন্যাসও এখনো পত্রিকার পাতায় অগ্রন্থিত রয়েছে।

রামকুমার শারীরিক কুশলে থাকুন এবং আরো অনেক লিখুন। যারা এতদিন কোনো পুরস্কারের আড়ম্বর ছাড়াই তাঁর আখ্যানধর্মে মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর সাহিত্যের খাতির করেছি, আবার তাঁর লেখা নিয়ে পর্যাপ্ত আশা পূরণ না-হলে বেজায় খুঁতখুঁত করেছি, যারা পাঠক রামকুমারের একাগ্রতায় নির্ভর করি এবং তাঁর ধৈর্যের উপর অত্যাচার করি, তাদের পক্ষে, রামকুমারের সাহিত্যকর্মের সেই পরিচিতদের পক্ষে এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁকে পৃথক কোনো অভিনন্দন জানানো বাহুল্যমাত্র। তেমন বাহুল্যে রামকুমারও সংকুচিতই হবেন। তারা বরং আজ রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই স্বীকৃতির সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে অভিনন্দন জানাই।

মাদলে নতুন বোল, আবহমান, নরেন্দ্রপুর, ১৯৮৪

রামকুমারের গল্পের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা : দেবেশ রায়

পরিচয়, এপ্রিল ১৯৮৫

রামকুমারের অনেক গল্পেই কথকতার ভঙ্গিটা আসে। এই সংকলনে তার ভাল উদাহরণ 'পেয়ারা বুড়ো পান্তা বুড়ি'। সে গল্প শুরুই হয় এই ভঙ্গিতে— 'এক গাঁয়ে এক পেয়ারা বুড়ো আর এক পান্তা বুড়ি থাকে। তাদের ঝুপড়ি দুটো গাঁয়ের একেবারে এক কোণায়। পেয়ারা বুড়োর ঝুপড়িটা পুবমুখো আর পান্তা বুড়ির ঝুপড়িটা পশ্চিমমুখো। দুটো ঝুপড়ির তফাৎ একটা পুকুরের।'

এর পর গল্প এই বাচনেই এগতে থাকে। গল্পের মূল বিষয় হয়ে ওঠে গ্রামের এই দুই দরিদ্রতম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দৈনন্দিন। তাতে বুড়ো-বুড়ির অতীত যেমন আসে তেমনি আসে তাদের বর্তমান। কিন্তু মূল ঘটনা এক কৌতুককেই যেন পালন করতে থাকে— পান্তা বুড়ির পেয়ারা খাওয়ার শখ ও চেষ্টা, পেয়ারা বুড়োর পান্তা ভাত খাওয়ার লোভ ও প্রয়াস। আর, সে-রকমই এক রাতের ঘটনা নিয়ে দুজনেরই হেনস্তা— গল্পের প্রথম অংশ। গল্পের দ্বিতীয় অংশ তুলনায় একটু ছোট। কিছু দিন পর পেয়ারা বুড়ো গাঁয়ের এক মাঠ থেকে পাকা ফুটি চুরি করে পাহারাদারদের হাত থেকে বাঁচতে পান্তা বুড়ির ঘরে ঢুকে পড়ে। শেষে সেই বিছানাতেই সে আশ্রয় পায় এবং দু জনে মিলেই গ্রামের লোকজনকে শাপশাপান্ত করতে থাকে।

কথকথার যে-ভঙ্গিটিকে রামকুমারের গল্পের সরলতা বলে মনে হয়, একটু নজর করে দেখলে বোঝা যায় সেটিই রামকুমার স্টাইল হিসেবে সচেতন ভাবে চর্চা করছেন। তাই বুড়ো বুড়ির প্রথম চুরির ঘটনায় গ্রামের লোকের হাতে তাদের নিগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামকুমার কথকতার স্বাচ্ছন্দ্যেই লেখেন, 'শিলিগুড়ি থেকে আনা ভজহরির জাপানি টর্চটা ঝলসে উঠল', 'জরুরি অবস্থা ঘোষণার পাঁচ মাসের মধ্যে তিন-তিনখানা চাকরির চিঠি দেখে সবাই ভাবল এর পর সব বেকারই চাকরি পাবে,' 'বিজন ঘোষ খানিক পরে

মোটর সাইকেল নিয়ে এল...পাঞ্জাবিটা একটু তুলে পেট চুলকোতে লাগল। হাতের যথেষ্ট ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পিস্তলখানা।'

এই ভাবেই ঘটে রামকুমারের গল্পের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা। এমন-কি, পরস্পরের কাছ থেকে চুরি যখন সম্মিলিত চুরি হয়ে যায়— তখন তার ভিতরও রামকুমার একটা সূক্ষ্ম আয়রনি ঢুকিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু এই সচেতনতা সত্ত্বেও কথকতার এই ভঙ্গি গল্পের মূল বিষয়টিকে একটু সরল না করে পারে না। রামকুমারের অনেক গল্পে এই সরলতার ত্রুটিও থেকে যায়।

যদিও, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলা দরকার, এই সংকলনে তাঁর সবচেয়ে সাফল্যের যে-কয়েকটি প্রমাণ আছে, সেখানে এই সচেতন কথকতার স্টাইলই তাঁর গল্পকে এক মৌলিকতা দিয়েছে এবং সাফল্যও তাঁর সে-ক্ষেত্রে কম নয়। 'বৌ, মেয়ে, অ্যালসেসিয়ান ও পাইপ' যদি গ্রাম-শহরের অসংগতির গল্প, তা হলে 'দায়বদ্ধ' ও 'গোষ্ঠ'— গ্রামেরই আধুনিক কাহিনী— কথকতার সচেতন স্টাইল সেখানে রামকুমারের আত্মসচেতন স্টাইল। 'দায়বদ্ধ' গল্পে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে ছোটকৃষক বা ভাগচাষীর স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা আমাদের অপরিবর্তিত গ্রামীণ অর্থনীতির অন্তর্গতিতে তৈরি নয়, বাইরে থেকে আরোপিত এক ব্যবস্থার ফল— এই সত্যটিকে রামকুমার ধরতে পারেন গ্রামীণ অভিজ্ঞতার বেশ গভীর থেকে। তাই এইটুকু গল্পে অনায়াসে তিনি ব্যাঙ্ক লোনের নতুন ব্যবস্থার বর্ণনার পাশেই আনতে পারেন বৃষ্টির জন্যে মেয়েদের প্রাচীন ব্রত আর সেই একই প্রসঙ্গে, প্রায় একই বাক্যে লেখেন, 'গদাই মোড়ের চায়ের দোকানে বলল— "কংসাবতী ক্যানেলে জল ছাড়বে।"' কিন্তু খরার বিরুদ্ধে মেয়েলি ব্রত আর ক্যানেলি বিজ্ঞান সমানই বিফল। ঠিক এই একই কৌশলে ব্যাঙ্কের লোনে কেনা বলদের চিকিৎসায় পরপর আসে গ্রামের গোবদ্যি আর ব্লকের ভেটারেনারি সার্জেন।

এ-সংকলনের সবচেয়ে ভাল গল্প, 'গোষ্ঠ'। ভাল শিল্পকর্মের নিজস্ব এক সম্পূর্ণতা জুটে যায় যাকে বিশ্লেষণে ধরা যায় না। গল্পটিতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের এক রাখালবালকের জীবন মহাকাব্যের আয়তন পেয়েছে। রামকুমার এই আধুনিক অথচ ধিক্কারযোগ্য চিরন্তনতার রাখাল বালকটিকে এইভাবে প্রথমে উপস্থিত করেন, 'কত্তাদের দেওয়া টেরিলিনের আধছেঁড়া জামার উপরের বোতাম দুটো আঁটে। আটকে কি হয়, আবার বেরিয়ে আসবে। ঘরদুটোর ব্যাঁত এমন ফাঁড়া বোতামটি ঢুকবে ফুস করে, বেরিয়ে আসবে ফচ করে। ...জামাটা বড় পছন্দ হয়েছে লক্ষ্মণের— বেশ বড় সড়। হাঁটু পর্যন্ত শীত লাগবেনি।' তারপর এই ক্রমেই বিস্তৃত কাহিনীতে আসে শীত কাটাবার জন্যে রাখালবালকদের সমবেত ছৌনৃত্য, হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া গাভিন ভেড়ার সন্ধানে লক্ষ্মণের বালক পা দুটোর পাগলের মত ছোটা, পুরুলিয়ার প্রাচীনতম ভারতীয় মৃত্তিকায় নবীনতম এক ভারতীয়ের এই ছোটা, আসন্ধ্যা ছোটা, সে সন্ধ্যার মুখে গাঁ-সীমান্তের বটগাছতলায় 'টেরিলিনের ঢলঢলে জামার বুকটা মুঠি করে আটকে ধরে', আর তার ভেড়াটাকে পেয়ে যায়। তারপর সেই শীতঘন নক্ষত্রজাগর রাতে এই কিশোর তার সারাদিনের খিদে মেটায় ভেড়ার স্তনে মুখ দিয়ে। এই মানবশিশুর পশুস্তন্য পানের যে-বিবরণ রামকুমার প্রায় দু পাতা জুড়ে দিয়েছেন তা বাংলা ছোটগল্পের এক স্মরণীয় অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সাফল্যও তাঁকে গল্পের লক্ষ থেকে সরিয়ে আনেনি। মানুষের শিশুকে দুধ খাইয়ে সেই ভেড়ার প্রসব বেদনা ওঠে। আর লক্ষ্মণ সেই প্রান্তরের রাত্রি থেকে আগুন নিয়ে আসে। মাতৃস্তন্য পেয়েছিল যে-জননীর কাছে, সেই আগুনে তার প্রসব ঘটায়। এই দীর্ঘ অংশে রামকুমারের শিল্পকৃতিত্ব আমাদের মহৎ অভিজ্ঞতার স্বাদ দেয় কিন্তু লেখক হিসেবে তাঁর আত্মসচেতনতার প্রমাণ হয়ে আছে গল্পের শেষটুকু। একটি বাচ্চা মরা বাচ্চা হওয়ার অপরাধে লক্ষ্মণের চাকরি যায়, ঘটনা মাত্র এইটুকু হলে বলা যেত যেন একটু রীতির ফাঁদেই পা দিলেন তিনি, যেমন দিয়ে ফেলেছেন এই সংকলনের নাম গল্পটিতেই, 'মাদলে নতুন বোল', কিন্তু রামকুমার আর-একটু এগোন। রাখালকিশোররা এই মালিকদের খোঁচায়। আর শেষে, 'লড়াটা ধরে টানতে টানতে লক্ষ্মণের মা ছেলেকে ঘরে নিয়ে যায়। ...শেষবার পেছন পানে তাকিয়ে গলা তুলে শুনিয়ে দেয়— "তোদের ঘরে না খাটলেও আমার ব্যাটার ভাত জুটবে বটে। ...আর কি আমার ব্যাটার বাগাল খাটার ঘর নাই!"'

চারণে প্রান্তরে, উত্থক প্রকাশনী, ১৯৯৩

আপাত সরল, অথচ জটিল : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোরক, প্রাক-শারদ, ১৯৯৪

'...গো' শব্দটা ভেসে আসে বহুদূর থেকে। ঠিক শব্দ নয়, স্বর, প্লুতস্বর। একটা ধ্বনি ক্রমশ চড়ায় উঠছে। উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তা স্বরক্ষেপণের নিজস্ব নিয়মে ক্ষীণ হয়ে আসছে। সবশেষে মিলিয়ে আছে, হারিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না আবার নতুন করে শুরু করা হচ্ছে।'

হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই শুরু হয়েছে নবীন কথাকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে'। শুরুটা যেভাবে হয়েছে, বাকি কাহিনী গড়িয়ে গিয়েছে প্রায় এমন উচ্চারণেই। একটা ধ্বনি ক্রমশ চড়ায় উঠে আবার নিজস্ব নিয়মেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, যতক্ষণ না আবার নতুন করে স্বরক্ষেপণ হচ্ছে। স্বরক্ষেপণের এই ওঠানামা রামকুমারের গোটা উপন্যাস জুড়ে। এ ধরনের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এর আগে লেখা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু রামকুমারের স্বর একটু অন্যরকম। একেবারে হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে উঠে এসেছে সুর, তাঁর রচনাবিন্যাস, তা বিস্তৃত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে, অবশেষে গভীর হয়ে দাগ কেটে বসে যায় পাঠকের হৃদয়ে। উপন্যাসের পাঠ শেষ হলে রক্তের ভেতরে তখন এক অন্য দোলাচল। পাঠক বহুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন রামকুমারের সৃষ্ট এক অদ্ভুত পৃথিবীর ভেতর— যে পৃথিবীতে 'আগুনের শিখার মতো লাল ধুলো গরুর ক্ষুরে মাথা পর্যন্ত উঠে আসে। আশ্বিনের ঝড়ের পর আর ভারী বৃষ্টি হয়নি। ...তেঁতুলের ডাল, কয়েতের পাতা, খড়ের পালুই, মাথার উপর ঝুঁকে আসা বাঁশের ঝাড়, আমড়ার গুঁড়ি— সবকিছুই মাঘের ধুলোতে লালে লাল।'

এ হেন প্রকৃতিতে টইটম্বুর হয়ে থাকে এ উপন্যাসের নায়ক কিশোর বিশু, গরুর পাল চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়াই যার অন্যতম প্রধান কাজ, গরুদের সঙ্গেই যার সবচেয়ে আত্মীয়তা, তাদের দেখ্‌ভাল করতেই যার জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়। একজন রাখাল বালক, যাদের আমরা গাঁয়ের পথেঘাটে লাঠি হাতে গরু চরাতে দেখি, তাকে প্রধান চরিত্র করে কোনও উপন্যাস লেখা নিঃসন্দেহে শক্ত কব্জির কাজ, এবং হ্যাঁ, সাহসও। রামকুমার সেই দুঃসাহস দেখিয়েছেন, এবং বলাবাহুল্য যথেষ্ট সফলও। বিশুর জীবনযাপন, তার গরু চরানো থেকে শুরু করে দিদি দাসীর সঙ্গে হাঁস নিয়ে খুনসুটি, কলহ, ভাব— সবই আশ্চর্য কুশলতায় এঁকেছেন লেখক। ছবিগুলো ঠিক এরকম— বিশু শাকপাতা দিয়ে ভাত খায়, তার দিদি গুচ্ছের গুগলি ধরে এনে ছাড়াচ্ছে আয়েস করে আর ভাবছে, 'বিশুকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে হাঁসগুলোকে গুগলি খাওয়াবে। এটাই তার সুখ।' ঝগড়াটা অনেক দূর গড়ায়, অথচ দাসীর হাঁস মৃতপ্রায় অবস্থায় পাওয়া গেল ভাত ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে

বিশু, 'আমাদের হাঁস?' —'না, বিষ্টুপুরের রাজাদের।' —ঝাঁঝের সঙ্গে বলে দাসী।' কিংবা বিশু খেতে খেতেই বলে, 'শাকটা খুব ভাল লাগছে, মা। গুগলি খেলে গা গুলোয়', অমনি লাফিয়ে ওঠে দাসী, 'মুখপোড়া, তোর গা গুলোয়! দিলে তো খাবি।'

সেই দাসী বিয়ের পর চলে যাওয়ার মুহূর্তে 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা আর বিশু তার কাছে আর থাকবে না।' তখনই বিশুর প্রতি তার ভিতরের টান পরিস্ফুট হয়, যা দিদি আর ছোটভাইয়ের ভেতরকার ভালবাসার এক চিরন্তন ছবি, যা এই উপন্যাসের মূল থিম্— ক্রমশ পরিণতিতে গিয়ে যা স্তব্ধ করে পাঠককে।

দাসী তখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার ভাবনায় অস্থির। সে চলে গেলে তার এই বিপুল পৃথিবীর দায়িত্ব তাহলে কার কাছে দিয়ে যাবে? গাঁয়ের জীবনযাপনের সঙ্গে তার নাড়ির বাঁধন তা ছিন্ন করে চলে যাওয়া মানে নিজের শিকড় উপড়ে পুরোপুরি ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া। সেই ভীষণ যন্ত্রণায় একাকী দগ্ধ হতে হতে 'হাঁসবাচ্চাগুলোর জন্যে বড় দুঃখ হয় দাসীর। এখনও গুগলি তুলতে পারে না। কে ওদের গুগলি তুলে দেবে? ভাতকুঁড়োতে কি বাঁচবে? সে যখন আবার ঘরে আসবে, হাঁসগুলো সব থাকবে? সরস্বতী তার গলা চিনতে পারবে? সে ডাকলে আগের মতো পুকুর থেকে ডাক শুনে উঠে আসবে?'

দাসীর এই ভাবনা, তার নিজস্ব একক পৃথিবীর ভেতর যে বিপুল গভীরতায় সে ওতপ্রোত হয়ে ছিল, সে-পৃথিবী গ্রামবাংলার আরও লক্ষ মেয়ের ভাবনা, মাত্র কয়েকটি বাক্যে তা কী অবলীলায় উঠে এসেছে রামকুমারের হাতে। হায় অবলা নারী, সে জানে না, তার এই একান্ত আপন পৃথিবীর কাছে সে আর কখনও ফিরে আসবে না। যেভাবে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার মুহূর্তে তার বসনপ্রান্ত টেনে ধরেছিল তারই পোষা মৃগশাবক, সেভাবেই দাসীকে প্রবলভাবে টেনে ধরছে আচরাচর প্রিয় পৃথিবী। কিন্তু শকুন্তলাকে কয়েকদিন পরেই ফিরে আসতে হয়েছিল ভাগ্যের ফেরে, আর ভাগ্যের অন্য এক লিখনে নিজের পৃথিবীতে আর কোনও দিন ফেরা হয়নি দাসীর। দুটি বিপরীত চিত্র, কিন্তু দুটোই পরম দুঃখের, যে দুঃখের শরিক আরও লক্ষ লক্ষ নারী।

কিন্তু দাসীবৃত্তান্ত আরও পরে, তার আগে বিশুর প্রেম ও বিবাহ। আরির সঙ্গে তার প্রেম এক অদ্ভুত জৈবিক তাড়নায়। 'সন্ধে হয়ে আসে। আরি ঘাস করে এসে ঝুড়িটা নামায়। পেটে জলের চাপ। ঝোপের দিকে যায়। দড়িটা খোলে, বসে। উঠে ইজেরটা কোমরে তোলে। হঠাৎ নাকে একটা চাপা গন্ধ আসে। পাঁঠা-পাঁঠা, পুরুষ পুরুষ। আরি ঘাড়টা ফেরায়। কাঁধের কাছে বিশুর মুখ।'

সে প্রেম অতএব রূপান্তরিত হল বিবাহে, সেও এক অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার হয়ে। 'পাঁচকড়ি মুখুয্যে পায়খানা বসতে গেসল। সব দেখেছে। যা দেখেছে তাতে সমস্ত ব্যাপারটাতে ঘণ্টা দুয়েক লাগার কথা। কিন্তু কিছু তো ঘটেছে।' অতএব 'বিয়ের তারিখ পাকা হয়ে যায়। বৈশাখের তের তারিখ।'

গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন এভাবেই বৈচিত্র্য পায় রামকুমারের দেখার ভিন্নতায়। গ্রামজীবন নিয়ে উপন্যাস এর আগেও বহু হয়েছে, ইদানীং আরও ভিন্নভাবে লেখা হচ্ছে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, কিন্তু রামকুমার অবশ্যই লেখায় আলাদা মাত্রা নিয়ে এসেছেন, যে লেখার ধার এবং ভার উপেক্ষণীয় নয়। খুবই ধীরগতিতে তাঁর উপন্যাসের শুরু, প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা এগুতে অনেকটাই সময় লাগে, তবু স্ক্রুয়ের মতো ক্রমশ গভীর থেকে আরও গভীরে পাঠককে নিয়ে যান রামকুমার। তাঁর লেখার স্টাইলের মতোই তাঁর সংলাপ, প্রকৃতি বর্ণন সবই আপাতদৃষ্টিতে নিস্পৃহ, নিস্তরঙ্গ, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই পাঠক টানটান হয়ে থাকেন, কারণ কখন যে চোরা ঘূর্ণীর মধ্যে পা সেঁধিয়ে যাবে! পা নয়, ক্রমশ গোটা শরীরই, কারণ তখন বিশু চলেছে সেই বিহার মুল্লুকে বিয়ে-হয়ে-যাওয়া তার দিদি দাসীর বাড়ি। সঙ্গে তার বাপের স্যাঙাৎ বন্ধু গোপাল বোষ্টম (হলুদ মাখানো স্যাঙাৎ নয়, মিশতে মিশতে ভাব) যে কিনা সম্বন্ধ এনেছিল দাসীর বিয়ের। বহু দূর পথ বাসে ট্রেনে বয়েল গাড়িতে পার হয়ে দাসীকে খুঁজে বার করতে যাওয়াই উপন্যাসের এক অন্যতম বিষয়। এ যেন বিশুর নিজেরই আর একটা অংশ খুঁজতে যাওয়া। পথে তাদের গাঁয়ের আর এক ঝিউড়ি পারুলের বাড়ি। তার বাড়ি এক রাত কাটাতে গিয়ে বিশুর মনে হয়, তার দিদিও কি এভাবে বদলে গেছে! কিন্তু তা আর দেখা হয়ে ওঠেনি বিশুর, কারণ সে যখন পৌঁছল, তার অনেক আগেই মারা গেছে তার দিদি। দৃশ্যটি হঠাৎ বজ্রপাতের মতো মনে হয় তাদের কাছে, পাঠকের কাছেও। পরে মনে হয়, এইটেই তো স্বাভাবিক। গরীব মেয়েদের তো এভাবেই বহুদূরে বিয়ে দিতে হয়, আর কখনও হয়তো দেখা হবে না জেনেই।

উপন্যাসের শেষ অংশে বিশু আর গোপালের আত্মধ্বংসের পর্ব। জামাইয়ের নামে কেস করতে গিয়ে কীভাবে সর্বস্ব খুইয়ে এল থানায়, সে বিবরণ খুবই বাস্তব এবং মর্মস্পর্শীও। দাসীর এই পরিণতি কখনও মনে পড়িয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের সেই গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের কথা, কখনও অপু আর দুর্গাকেও। তবু রামকুমারের কথনভঙ্গি অননুকরণীয়। তিনি তাঁর নিজের মতোই, তাঁর স্বকীয়তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তা ছাড়া, এও অদ্ভুত লাগে একই বছরের দুই শারদীয়ায় ভগীরথ মিশ্র লিখলেন 'চারণভূমি', রামকুমার লিখলেন 'চারণে প্রান্তরে', সে দুটি উপন্যাসই যথাক্রমে ভেড়া ও গরু চরানোর মতো দুই নগণ্য জীবিকাকে অবলম্বন করে, এবং আশ্চর্য, দুটিরই পটভূমিকা বাঁকুড়া জেলা, একজন কর্মসূত্রে, অন্যজন জন্মসূত্রে কাটিয়েছেন সেখানে এবং দেখেছেন দুটি পেশাকে। তবে মিল বলতে এটুকুই, লেখার বৈশিষ্ট্যে, অনুভূতিতে দুজনের মধ্যে হাজার মাইল ফারাক। তবে এহেন নগণ্য বিষয় নিয়ে এমন আপাতসরল অথচ জটিল উপন্যাস লেখা যেতে পারে তা নিশ্চয় বাংলা উপন্যাসের পাঠকদের কাছে ভাল লাগার খবর।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ, কলকাতা বইমেলা ১৯৯৪

শব্দ ও নিঃশব্দকে নিক্তি মেপে ওজন করে গাঁথা : শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য

বারোমাস, শারদীয় ১৯৯৪

রামকুমারের মানুষদের একটা অংশ ছুঁয়ে থাকে বাঁকুড়ার গ্রাম জঙ্গল খেত বাসরাস্তা চায়ের দোকান, তবু তারা অনন্তচারী অনেকেই। সে কথায় পরে আসছি। শ্লেষের কথা বলি। 'অনুভূতির স্তরভেদ' 'সমুদ্রতটে ওরা দশজন' 'নব রত্নাকরের উপাখ্যান' মূলত শ্লেষধর্মী গল্প। তিনটিতেই আবার একটা গল্পহীনতার ভাব আছে। 'অনুভূতির স্তরভেদে'র মধ্যবিত্তীয় খোলসপ্রিয়তা 'সমুদ্রতটে ওরা দশজনে'ও বিধৃত। তবে সেখানে যুবক-যুবতীর শরীরী প্রেমের ব্যঞ্জনায় স্তব্ধ সমুদ্রতট মধ্যবিত্ততার কলুষমুক্ত হতে চাইছে। অথচ অবাক লাগে— রামকুমারের প্রথম গল্প প্রথম পড়েই ভক্ত হয়ে উঠলাম আমি— যে এই দুর্বলতম গল্পটি সংকলনে স্থান পেল কেন? বৈচিত্র্যের লোভে? অথচ 'নব রত্নাকরের উপাখ্যান' নির্মেদ সরল, মনে রাখার মতো গল্প। পরশুরামের বাকরীতি স্মরণে আসতে পারে এই গল্পের সাধু গদ্য ও বর্ণনাভঙ্গি দেখে। জাবালি, ভরতের ঝুমঝুমি, মহেশের মহাযাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ

হাসি মিলিয়ে আপনার ভ্রূতে লিপ্ত হয়ে থাকবে হতাশার ব্যঞ্জনাসিক্ত বেদনা। যখন আপনি জানবেন কোনো রামায়ণকারের মহৎ সাধুতাই আজকের বেকার রত্নাকরদের সিদ্ধি দিতে পারবে না। সে বসে থাকবে পাপ নিয়ে, পাপবোধ নিয়ে। 'হস্তে যষ্টি নাই, সাংসারিক বন্ধন নাই, সম্মুখে নতুন জীবনের দিশারী মুনিবর নাই।'

'আকর্ষণ-বিকর্ষণ' গল্পের শেষ করাতের মতো কাটে শেষ লাইনে। তবু বলবো শ্লেষকে পরম মমতায় কাহিনীর মজ্জা রক্ত রসে মিলিয়ে দিতে পারেন নিপুণ স্বর্ণকারের মতো রামকুমার। শ্লেষকে চিনতে পারি না, বিষ অমৃত হয়ে ওঠে। একমাত্র বিভূতিভূষণকেই আমি পূর্বসূরী বলে চিনতে পেরেছি। নইলে 'জাতিস্মর', মৌজা ডোমপাটি', 'চরৈবেতি', 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি', 'হাউসে' গল্পের রাধাবিনোদ বাঁকুচাঁদ যে মনোভূমিজাত, সে মনোভূমি একমাত্র বিভূতিভূষণেরই ছিল। চারিদিকে বাস্তবের মায়ায় বড় বেশি ঐহিকতার মায়ায় করুণ মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে যারা। তফাৎ কেবল প্রেক্ষার, মূল্যমানের। শুধু জানতে হবে বিনোদ বাঁশি বাজাত। আবার ফুড মুভমেন্টের পরে, নকশাল বলে বন্দুকও চালিয়েছিল। এখন মালা গেঁথে অন্নসংস্থান করে সে। ছাব্বিশ বছর আগে ডোমপাটি থেকে উৎখাত বর্গাদার বিনোদ মদের ঘোরে জমি উদ্ধারের আশায় চলেছে ডোমপাটি। সে মিথের মতো শুনেছে যে তার পূর্বপুরুষ সানাইতে শ্বাস ভরে দম বেচে মল্ল রাজার কাছে শত শত একর উপহার পেয়েছিল। সেই বিনোদ মিথ মথিত হয়ে চলে বাঁশি বাজাতে বাজাতে।

কবিতার চিত্রাবলীতে রামকুমার রূপকের মধ্যে তাঁর মমতাকে নিবিষ্ট করে দেন চূড়ান্ত সিদ্ধির অভিমুখে। 'বিনোদের চারপাশ জুড়ে এক নিবিড় স্বরবিন্যাস ফ্লুটের বাগেশ্রী বাতাসে মিশতে থাকে। ...স্বরের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। বাতাসের চলার নিজস্ব নিয়মে ভারী বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে শূন্যতার সন্ধানে। সুরেলা বাতাস জমা হতে থাকে তালের ভাসমান শেকড়ের ছিদ্রে, কাঠঠোকরার গহ্বরে, পাকুড়ের কোটরে, ইউক্যালিপটাসের খোলসের ফাঁকে ফাঁকে, বাবুইয়ের বাসায়। ... কাটা ধানের মাঠে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বাঁশিতে সুর বাজে। সুর ছড়ায়, সুর প্রবাহিত হয়। ইঁদুরের গর্ত পূর্ণ হয়। শেয়ালের গর্তের আবহে পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির বুকে হাজার শূন্যতা। সেই শূন্যতা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে পূর্ণতা পায় প্রকৃতির শ্বাসের আরোহে, অবরোহে। প্রকৃতি বিনোদের ফ্লুটে স্বর ভরে দেয়।... বিনোদ শীতের বাতাস। বিনোদের ফ্লুট ডোমপাটির জোতজমি, গাছপালা, পুকুর-ডোবা। বিনোদের ফ্লুটের ভেতর কয়েকশ একরের প্রকৃতি ...বিনোদ ক্রমশ প্রকৃতি থেকে সরে যেতে থাকে।...অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে বিনোদের নিজস্ব স্বরের ...বিনোদের শরীরে নেশার টান আলগা হয়ে আসে। বিনোদ বোঝে জামকুঁড়ি যাওয়া অর্থহীন। ছাব্বিশ সাতাশ সাল পরে কে চিনবে তাকে?'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি যদি ক্লান্ত না করে থাকে আপনাদের, তবে তো রামকুমারের কবিতার কৃতিত্ব, শব্দ আর নিঃশব্দকে নিক্তি মেপে ওজন করে, পদ্যের মতো গদ্যতেও গাঁথতে পারেন তিনি, গল্প শেষ হবার মুখে কাব্যহৃদি এই দীর্ঘ নিসর্গচিত্র শাড়ির আঁচলের মতো মেলে দেন সামনে। গল্পটি পড়ে দেখবেন, পরে দেখবেন আমি একবর্ণও মিথ্যা বলিনি। রামকুমার মসলিনের মতো গল্পের অঙ্গুরীয় আয়তিতে শ্লেষ চালান করে দেন— চেনা দায় হয়। আবার এই দার্শনিক বিনোদের পাশে বসে আছে 'জাতিস্মরে'র রাধা। প্রসঙ্গত বলি এ গল্পটিকে অন্যতম আধুনিক প্রেমের গল্প বলতে ইচ্ছা করে আমার। নায়ক সত্তরোন্মুখ বোষ্টম সংসারত্যাগী, নায়িকা তার স্ত্রী সংসারচক্রপিষ্ট ইহমায়াবদ্ধ রাধা। তাদের দেখা হয় মনোহরতলার কীর্তনের মেলায়। সেখানে ঐহিকের রূপকে পারত্রিকের পূজা হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে ঘর ছাড়ে, সংসার ত্যাজে মানুষ এই প্রেক্ষায় পদাবলী-বিধৃত রাধার পূর্বরাগ আক্ষেপোক্তি বৃদ্ধা নায়িকা রাধার বুকে স্বরসঙ্গম বাজিয়ে দেয়, কাঁদিয়ে দেয় তাকে। আর এই রাধাই কিনা ভাগচাষ রেকর্ড অনুযায়ী ধান পাচ্ছে না বলে স্বামীর কাছে অভিযোগ করতে এসেছিল? স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল নিরাপত্তার অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে?

পাঠক, আপনিই নির্ণয় করুন এ কি দ্বাপর না কলিকাল। এ কালের বোষ্টম কিষ্টদাস আর বর্গাদার পত্নীর অন্বয়ে কী বিরহ, এই মাথুরের তাৎপর্য কী? আর আপনারাই পড়ে দেখুন 'চরৈবেতি' আর 'হাউসে' গল্পে ইঙ্গিতময়তায় আকাশস্পর্শী হয়ে ওঠেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। 'হাউসে' গল্পের উঠোনে বাদবিতণ্ডা হয়, একদা ইউনিয়ন নেতা কানাই ভট্টাচার্যর সঙ্গে কংগ্রেসের পার্টি কর্মীর। হাউসেকে তখন পার্শ্বচরিত্র মনে হয়। তবু সেই তো দেবদূতের মতো অন্য গ্রহের মানুষের মতো বলে ব্যাঙ্কের লোনে সে চিড়িয়াখানা করবে। বাস্তবের ইঁট খসে পড়তে চায় যেন। বাস্তবতায় পা রেখে ক্ষুধার্ত হাউসে কেবল শিকার খোঁজে। পাখির স্বর নকল করে। এই পেশা নষ্ট হলে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে সাপের পেঁজি নিয়ে হাউসে চলে যায়। নিশ্চিন্ত কৃষিকার্য ছেড়ে বেদিয়া বনে যায়। এর উত্তর সাদামাটা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোতে নেই। এই চরিত্রের বৈভব বিশ্বের নিজস্ব সম্পদ। নিষাদ গোপা কেন সচ্ছল গার্হস্থ্য ছেড়ে চলে গেল? পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা। এই ঊর্ধ্বমুখী অসংকোচ চরিত্রগুলির কথা কেবল ছোটোগল্পই বলতে পারে।

এক ডজন বিশিষ্ট গল্পের ভিতরে কোনো একটির গায়ে তকমা আঁটা কঠিন, তবু বলি ধ্রুপদীতম হবে প্রথম গল্পটিই, 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ' গল্পে যে সুচাঁদ খিদে সহ্য করতে না পেরে ইলেকট্রিক পোস্টে ঝুলতে চায়, সেখানে পীরিতি করা শক খাওয়া জোড়াঘুঘুর মৃতদেহ নিয়ে ঘরে ফেরে, মাংস রান্না করে খায় সে, তার ক্ষুধার্ত পরিবার। এমনকি দুধসাদা জ্যোৎস্নায় গানও গেয়ে ওঠে। 'ঝিঙ্গালতে কাল্লালতে বাজ লাগলি / মাইরি বাজ লাগলি/ তকে লাজ না লাগেলো / মুচকা হাঁসলি / মাইরি মুচকা হাঁসলি।' ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর জন্য শোক সর্বদাই শ্লোক হয়ে যায় কিন্তু। সুচাঁদ ঘুঘুর মাংস খাক আর নাই খাক, বোঝা যায় কেন গল্পসংকলনের ভূমিকায় রামকুমার লিখেছেন 'আমার গল্পে চরিত্রগুলির স্ববিরোধ আসে, কিন্তু, হয়তো নিজস্ব স্ববিরোধের কারণে, সে সবের সঙ্গে আপস করি।'

ভাঙা নীড়ের ডানা। অভিজাত প্রকাশনী। কলকাতা ১৯৯৬

ভাল উপন্যাস ও অপসংস্কৃতি : আশীষ বর্মন

প্রতিদিন, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

নতুন কোনও সাহিত্যিকের উপন্যাস মন টানলে আমি উৎসাহ বোধ করি। কেননা চালু বিনোদনী সাহিত্যে চোখ বুলিয়ে মানসিক বিষণ্ণতা জাগে। সব লেখাই যে সৃজনের দক্ষতায় আকর্ষণ করবে এমন আশা বাতুলতা। পৃথিবীর কোন দেশে তেমন অভাবনীয় অবস্থা আছে বলে বিশ্বাস হয় না। কাজেই তেমন আশা আমার নেই। তবু প্রখ্যাত লেখকের রচনা যখন প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অসার তারল্যে এগোয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে লেখক দৌড়ের ত্বরায়, রচনাবিষয়ে আদৌ মন দেননি। নিজের সৃষ্টি ক্ষমতা সম্বন্ধে এহেন অহংকারহীনতা আমাকে বিমূঢ় করে। অন্তত পাঠযোগ্য উপন্যাস খুঁজি।...

অতঃপর রামকুমার মুখোপাধ্যায়-এর চটি উপন্যাস বা গত শতাব্দী খ্যাত

লং শর্ট স্টোরি, ভাঙা নীড়ের ডানা, হাতে আসে। উপন্যাসটির রোমান্টিক শিরোনাম আমায় ঈষৎ গুটিয়ে দিলেও বইটি পড়া আরম্ভ করে খুব খুশি হই। আমি এঁর লেখা ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। ভেবেছিলুম একেবারে নতুন লেখক। পরে অবশ্য বই-এর লেখক পরিচিতিতে জানলুম এঁর আরও দু'একটি বই বর্তমান, এবং রামকুমারবাবু লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। দুর্ভাগ্যত, বয়সের আলস্যে আমি সে-সবের সন্ধান পাইনি।

'ভাঙা নীড়ের ডানা' পড়তে পড়তে আমার মনে হয় ঔপন্যাসিক পাকা লেখক। তাঁর রচনা ভাবাবেগবিহ্বল নয়, অথচ মরমী। অর্থাৎ তাঁর সৃজনের সংযমে, অনুভব ও চিন্তা অতিকথনে বিপ্রস্ত এবং প্যাতপেতে না হয়ে, এক সংহত সৌষ্ঠব অর্জেছে। হালের সাহিত্য বা আরও সঠিক উচ্চারণ, উপন্যাসের আবহাওয়া, এহেন লেখনীর পরিমিত পরিচ্ছন্নতা, খুবই স্বাগত। অন্তত আমার কাছে। উপন্যাসটির আখ্যান বস্তু বাংলা সাহিত্যের সীমিত বিষয়-ভূমির ব্যাপ্তি এনেছে। যে সাধুবাদ খেলাধুলো সংক্রান্ত মতি নন্দীর বিভিন্ন উজ্জ্বল উপন্যাসগুলিরও প্রাপ্য। অন্যান্য শিল্পগুণসহ বিষয়বস্তুর আঙিনা প্রসারিত হলে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ে, বৃদ্ধি পায় সম্ভোগের কাঠামো, রুচি অনুযায়ী নির্বাচনের স্বাধীনতা। উপন্যাস বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়।

আলোচ্য উপন্যাসের প্লট হিসেবে দেখা যায় পক্ষী বিশারদ দিশা চৌধুরীকে। প্রবাসী বাঙালি দিশা এসেছেন হায়দরাবাদ থেকে এক বিপন্ন প্রজাতির পাখি, লেসার ফ্লোরিক্যান, তার খোঁজে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ এলাকায়। অন্যান্য পাখি আবিষ্কারের সঙ্গে এ প্রজাতির অনুসন্ধান তাঁর থিসিস ও অন্বিষ্টের অঙ্গ হয়ে রয়েছে।

শেষাবধি অবশ্য দিশা চৌধুরীর অন্বিষ্ট ব্যর্থ হয়। তিনি বাধ্যত ফিরে যান, কায়েমি স্বার্থের তৈরি বিপদ এড়িয়ে আপন কুলায়। কিন্তু নিজস্ব সব কাজের জিনিসপত্র কথা নোট শিট, ডায়েরি, ক্যামেরা বায়নাকুলার ইত্যাদি দিশা হারান। তাঁর স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায় সমর্থক ও সঙ্গী যাঁরা অভিন্ন প্রয়াসে বদ্ধ হয়ে গেছিলেন তাঁদের কথা। যেমন পঞ্চায়েত সদস্যা, হালে স্বাধিকার পাওয়া মাধবী মুর্মু; হতদরিদ্র পাখি প্রেমিক, পাখি বিক্রেতা ও শিকারি পচাই বাগ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বদন দত্ত। উপরন্তু স্বল্প রেখায় মূর্ত জনকয় বৈরী ব্যক্তিও।

এইসব বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে রামকুমারবাবু লেখনীর সযত্ন মুন্সিয়ানায় জড়িয়েছেন দিশার কর্মপ্রচেষ্টা, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মুকুরে। বিশেষভাবে নায়িকার অন্বিষ্টে এবং অনুভবে একাত্ম হয়ে ওঠে মাধবী মুর্মু ও পচাই বাগ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বদন দত্তও। এরা পৃথক পৃথক চরিত্রের স্বকীয়তায় ভাস্বর।

কম-বেশি দিশার বৈরীপক্ষে দাঁড়িয়েছেন পাখিবাজ, যিনি পক্ষী ভোজনে ও বাজারে চালানে মনস্ক সেই প্রশান্ত মণ্ডল; ঘুঘুড়ে ফরেস্ট অফিসার, বেআইনি গাছ লুঠের ঠিকেদার চরিত্র। এহেন চরিত্র এখনও স্বল্প লেখায় ও পরিসরে দাঁড়িয়ে যায়। তার একটা প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, তরুণী ও জিনস পরনে সুন্দরী দিশাকে নিয়ে কেতাবের আদ্যন্ত দুষ্টের বা পুরুষের যৌন অভিলাষ দপদপ করে না। বরং দিশার কাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই, লেখাটির শেষাংশে, এতাদৃশ প্রয়াসের ইঙ্গিত মেলে। সে ইঙ্গিত মূলত প্রতিহিংসামূলক পুরুষী প্রচেষ্টা। যে প্রতিহিংসার সাক্ষ্য হিসেবে আজও সাম্প্রদায়িকতায়, জাত-পাতের বিরোধে, দুর্বলের উপর অত্যাচারে প্রদেশে গ্রাম জ্বলে, খুনজখম হয়, হয় অকথ্য বলাৎকারও।

যৌনতার অপ্রাসঙ্গিক উদ্ভাবনও আজকালকার বিনোদনী সাহিত্যের অনায়াসে ব্যবহৃত চচ্চড়ি। দেশে কি বিদেশে অক্ষম রচনায় যৌনতার পুঞ্জ বেরোয় পাঠক মজাতে। রামকুমারবাবুর আলোচ্য উপন্যাসে, ভিন্ন প্রয়াসে এটির নির্মাণে, সে ধরনের এঁটোকাঁটার ক্লেদ নেই। যুবতী, সুঠাম নায়িকা কর্ম উপলক্ষে বনে-জঙ্গলে ঘুরছে, একাকী ঘরে থাকে অপরিচিত গ্রামীণ পরিবেশে, কায়েমি স্বার্থ আঘাত লাগায় চটছে, অথচ অচিরে দিশার ওপর কামার্তের হামলা না হওয়ায় যাঁরা নিরাশ হবেন, তাঁদের এ রচনা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

অবশ্য তার অর্থ আদৌ একথা নয় যে, সাহিত্যে যৌনতার স্থান নিষিদ্ধ। তাহলে তো রামায়ণ মহাভারত থেকে পাপ-পুণ্যে গাঁথা টলস্টয়ের উপন্যাস রেজারেকশান বা যাবতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যই হিটলারিয় অগ্নিকাণ্ডে সমাপ্তি পায়। তার অর্থ কেবল এটুকুই যে, অন্যান্য মৌল মানবিক বোধগুলির সঙ্গে, যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্যথাবোধ ও আরাম, প্রেম-ঈর্ষা, স্মৃতি-মনন ইত্যাকার সমস্ত বোধাবোধের ভারসাম্য ব্যতিরেকে, সাহিত্য-শিল্পে যৌনতার প্রাদুর্ভাব রচনাকে ডোবায়। অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা এই ভারসাম্যহীনতাতেই নিহিত, অন্য কোনও মাত্রায় নয়।

মিছিলের পরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৮

উপন্যাসের নতুন জগৎ : গড়া ও ভাঙা : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

দিবারাত্রির কাব্য, জানুয়ারি-জুন ১৯৯৯

উপন্যাসের প্রচলিত নির্মিতিটি উপনিবেশবাদের সৃষ্টি। এই পাঠকৃতিটি ভেঙে ফেলতে না পারলে বিষয়ের সীমারেখাও ভাঙা যাবে না। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মিছিলের পরে' প্রচলিত নির্মিতি এবং বিষয়ের সীমারেখাকে ভাঙার চমৎকার উদাহরণ। এই জাতীয় রচনায় লেখক নিজেকে গড়ে তোলেন না, বরং নিজেকে বিগঠিত করতে থাকেন। তিনি এমন সব শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করেন যাকে প্রচলিত অর্থে ব্যাখ্যা করা যাবে না, পাঠককেই এগুলো বিনির্মাণ করে গড়তে হবে। উপন্যাসটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথাও এই প্রসঙ্গে এনে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাকরণসম্মত আনুষ্ঠানিক ভাষণ বা শব্দ যেন নির্দিষ্ট অর্থ দিয়ে ঘেরা। রামকুমার উপন্যাসে কেবল সেই ভাষাই ব্যবহার করেন যা তাঁর চরিত্রগুলির কেবল মুখের ভাষাই নয়, তাদের সমস্ত কাজ এবং বিশ্বাসেরও ভাষা। এই ভাষা ছাড়া চরিত্র বা কাহিনী কিছুই গ্রহণযোগ্য হত না। ভাষার এই পার্থক্য আবার সংস্কৃতির পার্থক্যটিও ধরিয়ে দেয়। ভাষার বাইরেও অবশ্য আলাদা একটা জগৎ থাকে। সে জগৎ মিথের জগৎ, লোকসংগীতের এবং লোকবিশ্বাসের জগৎ। রামকুমার এই জগতের সঙ্গে অনায়াস নৈপুণ্যে একেবার আজকের রাজনীতির জগৎটি মিলিয়ে দেন। ব্রিগেডে লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েতের কথা আমাদের জানা। কিন্তু সেই জমায়েতের কয়েকজন দলছুট মানুষ রাত্রিবেলা ব্রিগেডের ঠিক মাঝখানে নিশান পুঁতে গোল হয়ে বসে যখন রূপকথা ও একালের জীবনের কথাকে ক্রমাগত মিলিয়ে দিতে থাকে তখন রামকুমার সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন। বিগ্রেডের চেনা গাছপালা বিশাল প্রান্তর রাত্রির অন্ধকারে ক্রমশ এক অলৌকিক রূপ নিতে থাকে। কিন্তু অলৌকিক আগুন যেহেতু লৌকিক অন্ন খোঁজে তাই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দলছুটদের যন্ত্রণার আর সংগ্রামের কাহিনীও শোনা যায়।

কথকথার ঢং-টি ব্যবহৃত হওয়ার জন্য উপন্যাসের ভাষায় মাঝে মাঝে কবিতার ছোঁয়া লেগে যায়। কিন্তু ভাষা কোথাও আবেগে এলিয়ে পড়ে না। বরং মাঝে মাঝেই তার মধ্যে মিছিলের গর্জন বা লড়াইয়ের আওয়াজ শোনা যায়—

কাঠি জ্বলে, আলো ঝরে।
বাজি লড়ে সূর্য সাঁই।
জোড়া কাঠি ঠোকে।
হাতের আগুন শরীর ছড়ায়।
পাতার ঠোঁটে আলো জাগে
মিহি শব্দে পাতা পোড়ে।
আলো জ্বলে জামের শরীরে।

ব্রিগেডের আঁধার প্রান্তরে এইভাবেই পুরুলিয়ার সূর্য সাঁই, জলপাইগুড়ির বাসন্তী, হুগলীর নিমাই চক্রবর্তী, বর্ধমানের নন্দ পাড়ুই আর বাঁকুড়ার দামু ওরফে দামোদর মিছিলের এই দলছুটেরা বসে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে একসূত্রে গাঁথতে থাকে। কারণ, 'একই মন্ত্রে দীক্ষা আমাদের।' উপন্যাসের পরিকল্পনা ও বুনোট দুইই অভিনব। জমায়েতে নেতাদের কথা শোনবার পর গ্রামের মানুষ দলবেঁধে বাড়ি ফিরে যায় এটাই অভিজ্ঞতা। তখন সব মিলিয়ে তাদের একটা সত্তা, জনতা। কিন্তু তাদেরও যে নিজেদের অনেক বলবার কথা আছে এই জমায়েতের সুযোগ নিয়ে রামকুমার তাদেরই মুখে সেকথা বাকিদের জানিয়ে দেন। তার পর একসময় সকলের কাহিনী মিলে মিশে একটি কাহিনী হয়ে যায়। সব মিছিলই যেমন এক জায়গায় এসে মিশে যায় তেমনি সব কাহিনীই শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনী হয়ে যায়। আবার এই লড়াই তো থেমে থাকার নয়। তাই এদের সকলের কাহিনীর সঙ্গে ক্রমশই নতুন নতুন কাহিনী যুক্ত হতে থাকবে। তাছাড়া কিছু কিছু কথা অ-বলাই থেকে যাবে, তা থেকে যায় ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। পরের লড়াইয়ের কাহিনী তো তাদেরই লিখতে হবে। দেশে ফেরার আগে সেইজন্যই সূর্য সাঁই সকলকে মনে করিয়ে দেয়, 'থাক কিছু কাজ। পুরনো কাজের শরীরে জং ধরলে শুরু করা যাবে নতুন করে।' উপন্যাসের শেষের পঙ্‌ক্তিটি ব্যঞ্জনাগর্ভ, 'সূর্য সাঁই লাল নিশানটা তুলে নেয় কাঁধে।' সমাবেশের শেষে ব্রিগেডের মধ্যিখানে লাল নিশান পুঁতে সূর্য সাঁই তার কথকতার পালা শুরু করেছিল রাত্রিবেলা, আর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশান তুলে সকলকে নিয়ে সে ঘরের দিকে যাত্রা করে। মিছিলের পরেই তো আসল কাজের সূচনা। এইভাবেই রামকুমারদের হাতে বাংলা উপন্যাসের চেহারা ক্রমশ পালটে যায়। উপন্যাসের চরিত্র, ভাষা, এমনকি ঘটনাও অনেক অচেনা জগৎকে সামনে নিয়ে আসে, নায়ক চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাও তা ভেঙে দেয়। উপন্যাসকে বাঁচানোর এই দুরূহ দায়িত্ব যারা পালন করে চলেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদের দাবিদার।

পরিক্রমা, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ১৯৯৯

ভাল মন্দ গরিব বড়লোক নয় তাঁর লক্ষ্য রহস্যে ভরা মানবচরিত্র

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আজকাল, ৫ অগস্ট ২০০০

রামকুমার মুখোপাধ্যায় গল্প লেখেন না। পড়ে মনে হয়, তিনি ফেবল লিখছেন। ঈশপ্‌স ফেবল নয়। এ যে রামকুমার্স ফেবল। অব্যর্থ, অমোঘ অথচ সরল। তাঁর 'পরিক্রমা' গল্পগ্রন্থে যে-গল্পটিই পড়ছি, মনে হচ্ছে, এ-গল্প এভাবে ছাড়া লেখা যায় না।

দেশজ ভাষায় তিনি দক্ষ। বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষজনের লৌকিক আচার-আচরণ তাঁর নখদর্পণে। তাঁর যে-কোনও গল্পে আজকের গ্রামীণ মানুষজনের একটি হাস্যকর অথচ সত্যকারের সিচুয়েশন তিনি তুলে ধরেন। তার ভেতর থেকে আপনাআপনি কৌতুক, সত্য দুই-ই উঠে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা হল— এই তো মানুষের জীবন। এরকম সরল সিধে অথচ, অব্যর্থ গল্প খুব কমই পড়েছি। তাঁর শিল্পসৃষ্টির সামর্থ্যকে ভাষায় তুলে ধরার সামর্থ্য আমার নেই।

রামকুমারের জোর তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে। জোর দেখার দৃষ্টিতে। আপাত-কৌতুকময় বিবরণের ভেতর থেকে সরল সত্য উঠে আসে। এরকম লেখা লিখতে পারলে আমার গর্ব হত।

যে-কোনও বাঙালি লেখক দশটি ভাল গল্প লেখেন। তিনি এমন একটি কমপিটেন্স অর্জন করেন যা তাঁর গল্পকে উতরে দেয়। কিন্তু এই উতরে যাওয়ার পরেও একটি চাহিদা থাকে। তা হল— গল্পটি কি অনেক দিন ধরে পাঠকের মগজে বিঁধে থাকবে?

আমাদের লেখার আগে অগ্রজদের গল্পে থাকত অন্ত্যচমক। সেই স্তর আমরা পেরিয়ে এসেছি। গল্পকে খানিকটা ভেঙে চুরে আমরা তার ভেতর আপাত-অযৌক্তিক জাদুবাস্তবতার তুলি বুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কেউ কেউ। তাতে কোনও কোনও গল্প উতরে যাওয়ার পরেও একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে— আর সেজন্যই সে-সব গল্প পাঠকের মগজে বিঁধে গেছে। গল্পটি ক্ষণে-অক্ষণে তার মগজে হানা দিয়েছে।

রামকুমার কিন্তু তা করেননি। খুঁটিনাটি তিনি বিশদে দেখতে পান। তিনি তা-ই লিখেছেন। এই সব খুঁটিনাটির ভেতর হাস্যকর বৈসাদৃশ্য থাকে। তাও তিনি লিখেছেন। তিনি জাদুবাস্তবতার তুলি বোলাতে যাননি। বরং যা দেখতে পাচ্ছেন, তা-ই এঁকেছেন। কিন্তু এই আঁকা এত আত্মবিশ্বাসী পাকা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন যে মনে হয়, নিজে ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন।

একজন গবেষক-অধ্যাপক এক কালের স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বিমূঢ়। স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর জীবনের অতীতের সংগ্রামকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না। অথচ গবেষক অধ্যাপক খুব সিরিয়াস। তিনি প্রশ্ন করতে গিয়ে রীতিমত ধাক্কা খাচ্ছেন।

আরেকটি গল্পে একজন অভাবী মানুষ তালগাছে উঠেছে সংসারের সুরাহা করতে। ওপরে উঠে তার নিচের পৃথিবীকে একদম অন্যরকম লাগছে। সে আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। কী সাধারণ বিষয়! অথচ কী অসাধারণ লেখা!

'কাক ও কলম' গল্পটি গদ্যে লেখা জগৎ-নিরপেক্ষ একটি কবিতা। শব্দচয়ন, বৈপরীত্য পর্যবেক্ষণ গল্পের তোয়াক্কা না-করা রামকুমারকে একটি অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

'শরীরের ভাঙা গড়া' গল্পটিতে ফুলমণি অভাবী দিনমজুর। কিন্তু সে পঞ্চায়েতের সদস্য। একদিন সভায় হাজির হলে সে ২০ টাকা পায়। মহিলা বি ডি ও তার দেখা না পেয়ে ফিরে গেল। সে ধান রোয়। কোলের বাচ্চাকে বুকের দুধ দেয়। পঞ্চায়েত সদস্যের টাকায় সবাইকে জিলাপি খাওয়ায়। একটি অতিরিক্ত শব্দ নেই গল্পে। কোনও চমক নেই। সাদামাঠা গল্প। অথচ কী অসম্ভব তীক্ষ্ণ। একদম মনে গেঁথে যায়।

'জ্যোতিষী' গল্পে গাঁয়ে ইলেকট্রিক আসায় ভূত উবে গেছে। কালীর ভর হওয়া দাঁড়িয়েছে হিস্টিরিয়ায়। রামকুমার নিরুপায় মানুষের প্রতি মমতায় গভীর। তাদের তিনি ভাল মানুষ বানাননি। আবার মন্দ মানুষও বানাননি। ভাল-মন্দ বা গরিব-বড়লোক— এই সব তাঁর বিষয় বা লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য রহস্যে ভরা মানবচরিত্র। তিনি যা লেখেন, তা তিনি ভাল করে জানেন। চেনেন। তাঁর চেনা তিনি ভাষা দিয়ে পাঠককে চিনিয়ে দিতে পারেন। কোনও অসাধারণ মানুষ নিয়ে তিনি লেখেন না। আশপাশে নিত্যদিন যে-মানুষ রয়েছে, তা-ই

তাঁর লেখার বিষয়। এই দেখার ভেতর রয়েছে তাঁর অনিত্যবোধ, কৌতুকময় বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য ঘিরে এক নির্লিপ্ত হাসি। অনেকটা কোনারকের পাথরের সূর্যদেবের ঠোঁটের হাজার বছরের নির্লিপ্ত স্থির হাসি।

যে সব ভাষায় লেখা অনূদিত হয়েছে : অসমীয়া, ওড়িয়া, ইংরেজি, গুজরাতি, মৈথিলী, হিন্দি, তামিল ও সাঁওতালি। **সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি বই :** 'শাঁখা' (গল্প-সংকলন) দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০; 'শতাব্দী শেষের গল্প' (সাত ও আটের দশকের বাংলা ছোটগল্প বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ) মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০১। **অন্য বই :** 'সেরা নবীনদের সেরা গল্প' (অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় সাঁইত্রিশজন গল্পকারের গল্পের সংকলন)। **অনুবাদে উপন্যাস : টুটে ঘোসলে কে পঙ্খ,** (*ভাঙা নীড়ের ডানা*), হিন্দি ভাষান্তর : মুনমুন সরকার, রাধাকৃষ্ণ প্রকাশনী, নতুন দিল্লি, ২০০১।

সন্ধান চাই

অনেক প্রাক্তনীর শিক্ষাবর্ষের রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। অনেকের ঠিকানা পালটেছে— চিঠিপত্র ফেরত আসছে বারবার। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত প্রাক্তনীদের বর্তমান ঠিকানা জানতে আগ্রহী।

নাম	সদস্য নম্বর	শিক্ষাবর্ষ	নাম	সদস্য নম্বর	শিক্ষাবর্ষ
গুরুদাস ব্যানার্জী	এল্-০৯৭	৪৭-৪৮	শুভব্রত মণ্ডল	এল্-২৮৫	?
অরূপকুমার বসু	এল্-১৪৫	৫১-৫৩	নিমাইচন্দ্র ঘোষ	এল্-৬০১	?
দিব্যেন্দু নারায়ণ সরকার	এল্-১৫২	৫৬-৫৮	সুব্রত বিশ্বাস	এল্-১৮৬	?
পূর্ণেন্দু দাসগুপ্ত	এল্-০৭১	৫৭-৫৯	সুবীর রায়	এল্-১৯৮	?
দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়	এল্-৩৭২	৫৭-৫৯	রণজিৎকুমার দাঁ	এল্-২৩৯	?
অরুণকুমার চক্রবর্তী	এল্-১৮৯	৫৮-৬০	কৌশিক চ্যাটার্জী	এল্-২৪২	?
সুভাষচন্দ্র কুণ্ডু	এল্-২৯১	৫৮-৬০	উত্তমকুমার সাহা	এল্-২৪৪	?
মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়	এল্-০৩১	৫৯-৬১	শক্তিব্রত সুর রায়	এল্-২৮৪	?
সোমনাথ ভট্টাচার্য	এল্-০৪৯	৫৯-৬১	সুপ্রতীম চৌধুরী	এল্-২৮৭	?
গিরিশচন্দ্র মাইতি	এল্-০০৮	৬১-৬৪	তারাপদ ঘোড়ুই	এল্-৩০৬	?
তুষারকান্তি পাল	এল্-৬১৭	৬১-৬৪	দেবাশিস চ্যাটার্জী	এল্-৩২১	?
শান্তিময় মুখার্জী	এল্-৩৪৭	৬১-৬৪	অজিতকুমার চক্রবর্তী	এল্-৩৫৪	?
গোপাল মল্লিক	এল্-১৪৭	৭২-৭৫	প্রবীরকুমার মিত্র	এল্-৩২৮	?
স্বপনকুমার দাস	এল্-৪৫১	৭৩-৭৬	দীপংকর মণ্ডল	এল্-৪০৪	?
নিরঞ্জন সামন্ত	এল্-৫৮৯	৭৬-৭৯	অমিতাভ দেব	এল্-৪১৩	?
অভিজিৎ দাস	এল্-২১১	৭৯-৮২	গৌতমকুমার ঘোষ	এল্-৪৫২	?
অনুপম শেঠ	এল্-০৩২	৮০-৮২	সব্যসাচী ব্যানার্জী	?	?
সুমন্ত শেঠ	এল্-৪৩৮	৯৩-৯৫	রেবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	?	?

এছাড়া নিম্নলিখিত প্রাক্তনীদের শিক্ষাবর্ষ আমাদের জানা নেই।

নাম	সদস্য নম্বর	শিক্ষাবর্ষ
বিপ্লব মণ্ডল	এল্-১৮৩	?
অশোক রায়	এল্-২৮২	?
অভিজিৎ দত্ত	এল্-২৮৩	?

আশা করি সদস্যরা এঁদের সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে আমাদের পঞ্জি নির্ভুল রাখতে সাহায্য করবেন।

কৈলাস-মানস সরোবর

স্বামী সর্বগানন্দ

যাঁরা পাহাড় ভালোবাসেন তাঁদের কাছে কৈলাস-মানস দর্শন একটা ঈপ্সিত স্বপ্ন। এতটা অপ্রত্যাশিতভাবে সেই স্বপ্ন আমার বাস্তবায়িত হবে ভাবিনি। সূত্রপাত হয়েছিল এপ্রিলে। একদিন রাত্রে স্বামী আত্মেশানন্দ (সুরেশ মহারাজ) সিঙ্গাপুর থেকে ফোন করল। খেতে গিয়েছিলাম। খানিক পরে আবার ফোন এল। রাত ১১টায়। তিন হাজার মাইল দূর থেকে সোজসুজি বলল, 'অগস্টে কৈলাস-মানস যাচ্ছি এখানকার একদল ভক্তদের নিয়ে, আপনিও আসুন। কাঠমাণ্ডু চলে আসবেন, বাকিটা আমরা ব্যবস্থা করে নেব। শুধু পাশপোর্ট করিয়ে নেবেন, আর জেরক্স কপিটা জুন মাসের মধ্যে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেবেন।'

আমি মনে মনে এবারে অমরনাথ যাবার মতলব করে রেখেছি। হঠাৎ দেবাদিদেব কৈলাসপতির আহ্বান শুনে ভাবি কী করব। মনে হল অমরনাথ তো পরেও হতে পারে। পাশপোর্ট-ভিসা করে তিব্বতে কৈলাস-দর্শনের সুযোগ বারংবার আসবে না। আর অতো খরচই বা জোগাড় কোথা থেকে হবে। শুনেছি পঞ্চাশ-যাট হাজার টাকা লাগে। তা, সিঙ্গাপুরের ভক্তবৃন্দ যদি ভাগাভাগি করে দিয়ে দেন তাহলে তাদেরও পুণ্য, আমারও। কয়েকদিন পরে ই-মেলে আমার যাওয়ার ইচ্ছা ও অনুমতি প্রাপ্তির কথা সুরেশ মহারাজকে জানিয়ে দিলাম। ভিতরে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

* * *

দুভাবে যাওয়া যায়। ভারত সরকারের ব্যবস্থায় সর্বাধিক পাঁচ হাজার জন যেতে পারেন। উত্তরপ্রদেশের পিথোরাগড়, ধরচুলা, তাওয়াঘাট হয়ে নাভিঢাঙ ও গুরলা মান্ধাতার পাশ দিয়ে মানস হেঁটে যেতে হয়। হেঁটে ফিরতেও হয়। ঘোড়া নিলে নিজের খরচে হাজার তিরিশ টাকা ভারত সরকারকে জমা দিতে হয়। ভারতীয় সেনারা বর্ডার পেরিয়ে চীনের সেনার হাতে তুলে দেয়। যেতে ন-দিন, আসতে ন-দিন। আর একটা রুট হল নেপাল দিয়ে। সরকারের কোনো ব্যাপার নেই। ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। তারাই যৌথ ভিসা করিয়ে দেয়। গাড়ি, শেরপা, খাবার, তাঁবু, সব তারাই জোগাড় করে। একেবারে মানসের তীর পর্যন্ত গাড়ি চলে যায়। 'মানস পরিক্রমা' নব্বই কিলোমিটার। যদি সময় থাকে তীর্থযাত্রীরা হেঁটে পরিক্রমা করেন— তিনদিন ধরে। চড়াই-উৎরাই নেই তেমন। তারপর কৈলাসের পাদদেশে 'দারচেন' গ্রাম পর্যন্ত গাড়ি যায়। সেখান থেকে 'কৈলাস পরিক্রমা' ছাপান্ন কিলোমিটার। তিন দিন লাগে। গাড়ির রাস্তা নেই। চড়াই উৎরাই ভীষণ। একটা 'দোলমা পাস' আছে—১৯৫০০ ফুট উঁচু। তাছাড়া গ্লেসিয়ার পেরোতে হয়। ঘোড়া বা খচ্চর পাওয়া যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ ব্যক্তি ঘোড়ায় পরিক্রমা করেন। তিব্বতীরা শ্রাবণ মাসে (তাদের বিশেষ ক্যালেন্ডার আছে) দণ্ডী কাটতে কাটতে পরিক্রমা করেন। অমানুষিক। আমরা অবশ্য দেখিনি। দেখার কথাও নয়। কারণ আমরা গেছি বৃষ্টির সময়ে। তিব্বতীদের সেই মাসটা পার করে।

১১ অগস্টের বিমান বাতিল হয়ে ১২ অগস্ট ছাড়ল। তাও আবার সকাল ৮-১৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২ টোয়। দুপুরে অগত্যা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গেলাম। প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ফের দমদম চল। নেপাল টাইম বিকেল পৌনে চারটেতে কাঠমাণ্ডু পৌঁছলাম যখন, সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। চারিদিকে পাহাড় মাঝে বিশাল ভ্যালি। তাতে রানওয়ে। পুরো কাঠমাণ্ডু শহরটাই আকাশ থেকে দেখেছি—ভ্যালির ওপর। ভারি চমৎকার। 'অন্তর নাচে পুলকে'। সিঙ্গাপুরের দল আজ সকালেই এসে পৌঁছবে জানতাম। এয়ারপোর্টে শ্রীওয়াংপিন-এর সেক্রেটারি শ্রী চৌধুরি (নেপালি) এসেছিলেন নিতে। কলকাতা থেকে একই বিমানে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এবং অবসরপ্রাপ্ত মাইতি দম্পতিও কাঠমাণ্ডু এলেন। নেপালে ভারতীয় টাকা ভালোই চলে। ১০০ ভারতীয় টাকা মানে ১৬০ নেপালি টাকা। ওয়াংপিন এর পরিচয়টা দেওয়া হয়নি। উনিই সফর নির্দেশক। তাঁর কাজ হল এয়ারপোর্টে নিতে আসা। কাঠমাণ্ডুতে হোটেল ঠিক করা, কাঠমাণ্ডু শহর ঘুরিয়ে দেখানো, কৈলাস যাত্রার জন্য চাইনীজ গ্রুপ-ভিসা সংগ্রহ করা, নেপাল-চীন সীমান্তে পৌঁছনোর জন্য বাস ঠিক করা। তিব্বতে 'কাজের লোক' অর্থাৎ 'শেরপা' নিয়ে যেতেই হয়। তাই শেরপাদের সঙ্গে কথা বলে কারা যাবে, কত টাকা নেবে ইত্যাদি ঠিক করা। নেপালি গাড়ি চীনে ঢুকবে না। অতএব যাত্রীদের জন্য চীনা গাড়ির বন্দোবস্ত আগেভাগেই করে রাখা। যেখানে যেখানে রাত্রে থাকা হবে সেই সেই স্থানে গেস্ট হাউস থাকলে আগে থেকেই বুকিং করে রাখা। যদি গেস্ট হাউস না থাকে, সুবিধামতো কোথায় তাঁবু খাটানো হবে তার ব্যবস্থা করা। তাঁবু ভাড়া করে কাঠমাণ্ডুতেই সব ব্যবস্থা করে রাখা। আমাদের দলে মোট একচল্লিশ জন ছিলেন। এতএব চার জনের জন্য একটা গাড়ি ধরলে—দশটা গাড়ি। জাপানি টয়োটা জীপ, চলার পথে তেল

পাবে না। সুতরাং প্রায় দু-হাজার পাঁচশো কি. মি. চলার জন্য যথেষ্ট পেট্রল জোগাড় করে সঙ্গে নিয়ে চলার ব্যবস্থা করা। তেল অবশ্যই ট্রাকে করে যাবে। রান্নার গ্যাস, এবং প্রায় পঞ্চান্ন জনের ষোল দিনের খাবার (কাঁচা মাল) অন্য ট্রাকে যাবে, তার ব্যবস্থা করা। এবং কাঠমাণ্ডু ফিরে এসে সকলের যাতে বিমান টিকিট কনফার্ম থাকে সেই ব্যবস্থা করা! একচল্লিশ জনের একটা টীমের পরিপ্রেক্ষিতে তার পঁচিশ লাখ টাকার ব্যবসা। এর শতকরা ৯০ ভাগ সে আগেই পেয়েছে। বাকিটা তীর্থযাত্রীরা কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এলে পাবে—চুক্তিমতো।

* * *

কাঠমাণ্ডুতে গার্ডেন হোটেলে পৌঁছে দেখি পাঁচ-তারা ব্যবস্থা। কিন্তু সিঙ্গাপুরের দল অর্ধেকটা পৌঁছেছে, বাকি অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় দশ/বারোজন আগামীকাল পৌঁছবে। আরো কাণ্ড হয়েছে। যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁদের লাগেজ ব্যাংককে বিমান বদলের সময় থেকে গেছে। এই সব ক্ষেত্রে কেউ যদি লাগেজ ২৪ ঘণ্টার দেরির কারণে আমেরিকান একশো ডলার দাবি করে, তাহলে সেই বিমানসংস্থা তা দিতে বাধ্য থাকে। আমি অনেককে তাতালাম। কিন্তু কেউই আইনি-ঝঞ্ঝাটে যেতে রাজি হলেন না। তাঁদের দৃষ্টি এখন কৈলাস-মানসের দিকে।

কাঠমাণ্ডুতে যা দেখার দুদিনে দেখা হল। সকলে ক্লান্তও ছিল বটে। আমি ভাবলাম—আমিই ক্লান্ত। কারণ আগের দিন পর্যন্ত পুরোদমে অফিস-কাছারি করে যেন পালিয়েই এসেছি। পরে বুঝলাম, সকলেই তাই করেছে। বিশেষত ভারতের বাইরে অনাবাসী ভারতীয়দের অবসর খুবই কম থাকে। খেটে খেটে হয়— তবেই না বড়লোক।

শ্রীপশুপতিনাথের দর্শন হল সোমবার ১৪ অগাস্ট। একমাস ধরে শিবের পার্বণ চলে নেপালে। আজই তার শেষ দিন। সোমবার। কেমন ভিড় হবে বুঝতেই পারছেন। আমরা বোকার মতো বুঝতে না পেরে ওই ভিড়েই ঢুকে পড়েছিলাম। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল—একবার যদি পা হড়কে পড়ে, হাজার দশেক মানুষ আমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে! কখনো বা মনে হল—লাফিয়ে উঠে ভেসে যাই। তাহলে সকলের হাতে হাতে শুয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। তবু লম্বা বলে দূর থেকে শিবলিঙ্গ দর্শন হল। একটা ফোঁটাও পরিয়ে দিল কন্নড় পুরুতমশাই। শিবলিঙ্গের চারপাশে শিবের পাঁচটি মুখ খোদাই করা আছে। অন্য কোথাও এমন দেখিনি। কৈলাস যাত্রার আগে শ্রীপশুপতিনাথ-কে নিবেদন করে যেতে হয়। এবং কৈলাস থেকে ফিরে আবার তাঁকে পুজো নিবেদন করে ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাতে হয়। এটাই রীতি। এবং জ্যোতির্লিঙ্গ শিব যেখানে আছেন, শক্তিপীঠও থাকতেই হবে। ৫১ পীঠের এক পীঠ। পাহাড়ের ওপরে মা পর্বতবাসিনী গুহ্যেশ্বরী। বাগমতী গঙ্গার পাড়ে সুন্দর মন্দিরখানি। খোলা বাসরাস্তা থেকে বেশ দূরে। একটু চড়াই উঠলেই মাতা মন্দির। শুনলাম খুব জাগ্রত। মাতৃস্থানের পুজো হয় এখানে।

* *

আজ ১৫ অগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আমরা মুক্তির লক্ষ্যে কাঠমাণ্ডু ছেড়ে যাত্রা করলাম কৈলাসের উদ্দেশ্যে। ভারত থেকে সাত জন, শ্রীলঙ্কা থেকে দু-জন, মালয়েশিয়া থেকে তিন জন। লন্ডন থেকে একজন। বাকি ১৮ জন সিঙ্গাপুর থেকে। বয়োঃকনিষ্ঠ নীলকণ্ঠন্ বলল, তার বয়স পঁচিশ। সিঙ্গাপুর বিমান সংস্থায় স্টুয়ার্টের কাজ করে। লিম্ওয়া আর ওময় মাং, ভাই-বোন, যদিও চৈনিক, তবু সিঙ্গাপুরের নাগরিক। তারা ছিল বলে তিব্বতে আমাদের যোগাযোগের জটিলতা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। আমাদের ৩১ জনের মধ্যে আরো একজন জুটল। হায়দ্রাবাদের বদ্রী। সেও ট্র্যাভেল এজেন্ট। তাই ওয়াংপিন তাকে সুযোগ করে দিয়েছে কৈলাস-যাত্রা কীভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে তার ফার্স্ট-হ্যান্ড অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে। কিন্তু ওয়াংপিন-এর পরিচিত নজন নেপালির এই দলে যোগ দেওয়াটা কেউই পছন্দ করেনি। 'এ্যাডভেঞ্চার টিবেট' নামের যে ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে ওয়াংপিন যুক্ত, সেখানে তার পার্টনারকে না জানিয়েই ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা পরে সব জানতে পেরেছিলাম। ফলে ওয়াংপিন-এর লাভ হল, এদের দেয় মাথাপিছু ৬৫০০০ টাকা (নেপালি) সংস্থার হিসেবে ঢুকল না, পার্টনারও জানল না। প্রথমাবধি এই তিক্ততা অবশ্য যাত্রীদের উৎসাহ, ভক্তি এবং স্ফূর্তিকে দমিয়ে দিতে কখনোই পারেনি।

আমাদের যাবার পথটা একনজরে এইরকম— কাঠমাণ্ডু থেকে কোডারী (নেপাল-চীন সীমান্ত)। সেখানে একটা ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ আছে। হেঁটে পেরোতে হবে। নেপালের গাড়ি ওপারে যাবে না। ১৪ কি. মি. দূরে ঝাংমু শহর। সেখানে পাসপোর্ট-ভিসা পরীক্ষা করিয়ে ঢুকতে হবে। ঝাংমু থেকে তিরিশ কি. মি. দূরে ন্যালাম্। ন্যালাম্ থেকে সাগা। সেখানে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে গাড়িগুলোকে ফেরি করে পার করে দেবে। প্রায় দুশো কি. মি.। সাগা থেকে পারিয়াং। দুশো বাহান্ন কি. মি.। সেখান থেকে মানস সরোবর—দুশো কি. মি.।

কিন্তু আমাদের কপাললিখন অন্যরকম ছিল। বৃষ্টির কারণে ব্রহ্মপুত্রের জলস্ফীতি। অতএব ফেরি পার করে গাড়ি যাচ্ছে না। কী করা যায়? লাৎসে তিব্বতের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। সেখানে ব্রহ্মপুত্রের ওপর ব্রীজ আছে। সেটাই একমাত্র বিকল্প। যেখানে দুশো কি. মি. গেলেই সাগা পেতাম, সেখানে টিংরী, লাৎসে, সাম্সাং হয়ে সাগা, যেতে হবে ৫২০ কি. মি.। কপালে যদি লিখিতং ঝাঁটা কোন্ মিত্রা কিং করিষ্যতি? মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, হে দেবাদিদেব, কৈলাসে তোমার দর্শনটি যেন সুষ্ঠুভাবে হয়—পথের আপদ যতই হোক।

* * *

পথের বিবরণ

শেরপাদের দলপতি লাগ্পা। বয়স ২৫/২৬ হবে। রোগা, ফর্সা। কিন্তু গায়ে অসম্ভব শক্তি। সর্বদাই হাসে। ঝাংমুতে বলল—কী সব খাবার খাচ্ছেন, আমরা যখন রান্না করে খাওয়াবো তখন দেখবেন এর চেয়ে কত ভালো। আমি ঠিক বুঝিনি ব্যাপারটা। ধারণা ছিল শেরপারা মোট বইবে। ন্যালামে পৌঁছে দেখলাম তড়িঘড়ি পৌঁছানো মাত্রই ট্রাক থেকে গ্যাস সিলিন্ডার, স্টোভ, রান্নার বাসনপত্র, ফোল্ডিং টেবিল, চেয়ার, কাঁটা, চামচ, ন্যাপকিন, সস, চাটনি,

আচার, জ্যাম, জেলি, সব বের করে রান্নায় লেগে গেল! প্রায় পঞ্চান্ন জনের রান্না। তার ওপর ১৩০০০ ফুট উঁচুতে হাড়-হিম-করা ঠাণ্ডায় গরম গরম টম্যাটো সুপ্! আমরা তো প্রস্তুত ছিলাম না তেমন। ঝাংমুতে ১৮° /২০° তাপমাত্রা। হঠাৎ ন্যালামে রাত্রে ৫°-তে নেমে যাবে বুঝতে পারিনি। তার ওপর অক্সিজেন কম। জল ৮০°-তেই ফুটে যাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও রাত্রে গরম ভাত, ডাল সবজি, সুপ—কী নেই। মায় টম্যাটো-শশা-পেঁয়াজ দিয়ে স্যালাড পর্যন্ত। তার পরে শোয়ার আগে এক কাপ কফি।

ন্যালাম থেকে চল্লিশ কি. মি. দূরে মিলারেপা গুম্ফা। ১১৫০০ ফুট উচ্চতায়। বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাপুরুষ মিলারেপা প্রায় ৯৫০ বছর আগে এখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১১০০০ ফুটের ওপরে গাছ নেই। ছোট ছোট ঝোপ জাতীয় দেখা যায়। ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে কালো কালো ছোপ্ ছোপ্। শুনলাম ওগুলোকে নেপালী ভাষায় শিশু বলে। হাতে লাগলে ১২ ঘণ্টা চুলকোবে। ওগুলোই সিদ্ধ করে নাকি মিলারেপা খেতেন। ১৩০০০ ফুটের ওপরে সেগুলোও নেই। সম্পূর্ণ ন্যাড়া পাহাড়। ন্যাড়া হলে হবে কি, রঙের বৈচিত্র্য দেখে অবাক হচ্ছিলাম। গাঢ় নীল, হাল্কা নীল, গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, ধূসর, ফ্যাকাশে, গেরুয়া, লাল, গোলাপি, এমনকী বেগুনি রঙও দেখেছি পাহাড়ের গায়ে। আর দূরে দূরে তুষারাবৃত হিমালয়ের শীর্ষবৃন্দ যখন চোখে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল, কত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এরা কত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে একইভাবে বর্তমান। যখন মেঘ থাকছিল না, তখন আকাশটা অস্বাভাবিক নীল দেখেছি। সমতলভূমিতে অত নীল ভাবাও যাবে না। একটা ছবি তুলেছিলাম। তাতে রঙের বাহার দেখে নিজেই অবাক হই। এত রঙ তো খেয়াল করিনি—ছবিতে ঠিক ধরা পড়েছে।

ন্যালামে দুদিন থেকে একটু acclimatisation করে নিল সকলে। আরও ওপরে উঠতে হবে। টিমের লিডার ছিল সুরেশ মহারাজ। কত ওষুধই না এনেছে। দেখে চক্ষু ছানাবড়া। পরে ভাবলাম— সে তো নেতা। তাকে শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না। সকলের কথা ভাবতে হবে। আমাদের ছোট্ট ছোট্ট প্লাস্টিক পাউচে ডায়েমক্স, আর একটা গোলাপি ওষুধ দিয়ে বলল— রোজ এটা একটা ওটা একটা খেতে হবে। দলে ডাঃ কমল বোস, তার স্ত্রী ডাঃ পুষ্পা বোস, ডাঃ মোহনা থাকায় আমাদের সাহস ছিল অফুরন্ত। ডাক্তাররা আমার ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল। কিন্তু আমারই অবাধ্যতার কারণে উচ্চতার অসুখটা বেড়ে গেছিল। তবে দুদিন। তারপরে ঠিক হয়ে গেলাম।

ন্যালাম থেকে লাৎসে যখন যাচ্ছি, উল্টোমুখে চলেছি, অর্থাৎ কৈলাস পশ্চিম দিকে, আমরা চলেছি পূর্ব দিকে। তারপর উত্তরমুখ হয়ে আবার পশ্চিমে চলব। পথে পিচের রাস্তা টিংরীর কাছাকাছি ১৫-২০ কি. মি. পেলাম। বাকি মাটির রাস্তা। তাও গাড়ির চাকা গিয়ে গিয়ে মাঝখানটা উঁচু। টয়োটো গাড়ি বেশ উঁচু। তবু তার ডিফারেন্সিয়ালে ধাক্কা মারছে। টিংরী থেকে ডান দিকে গেলে এভারেস্ট মাত্র ৭০ কি. মি.। বেস ক্যাম্প ৩০ কি. মি., সেখান থেকে এভারেস্ট ৪০ কি. মি.। আমাদের কপাল মন্দ। এভারেস্ট মেঘে ঢাকা। কিছুই দেখা গেল না। আমরা যাব বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। রাস্তা এবার শুরু হল যা ভাষায় না বলে ইচ্ছে হচ্ছে পাঠককে ধরে নিয়ে যাই। গাড়ির চাকার তিন-চতুর্থাংশ পাথুরে কাদায় বসে গেছে। তবু গাড়ি চলছে। একটা গাড়ি সম্পূর্ণ কাদায় ঢুকে গেল। তখন অন্য গাড়ি এসে দড়ি দিয়ে টেনে তুলল। এইভাবে আক্ষরিক ভাবে নাচতে নাচতে যখন লাৎসে পৌঁছলাম তখন সকলে অর্ধমৃত।

লাৎসে বড় শহর। সব চৈনিক। মানুষ, বাড়ি, বেশভূষা, খাবার, গাড়ি। ইচ্ছে হল হোটেলে খাব। আমাদের হোটেলটা পাঁচ তারা বা তিন তারা না হলেও ওখানকার নামকরা। এক প্লেট ভেজিটেবল রাইস—১৫ ইউয়ান। এক ইউয়ান সমান ভারতীয় সাড়ে ছয় টাকা। এক প্লেট আলুভাজা পাঁচ ইউয়ান। ডাল পাওয়া গেল। অবশ্য ওদিকে শেরপারাও রেঁধে ছিল। আমরা অর্থাৎ অমিয় আর আমি বাসনাপূর্তির জন্য হোটেলে ঢুকেছিলাম। রাত্রে ১২টায় সব হঠাৎ অন্ধকার। তখন খাচ্ছি। কী ব্যাপার? এ সব দেশে সরকারি বিদ্যুৎ নেই। তাই সন্ধ্যার পর শহরে যা-কিছু আলো সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেনারেটর সহযোগে উৎপন্ন। চুক্তিমতো জেনারেটারম্যান ১২টায় জেনারেটার বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব—ক্যান্ডেল-লাইট ডিনার— আরও সম্মানজনক!

সকলেই কালকের ড্রাইভিং-এর পর একটু বিশ্রাম চাইছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাকভোরে বেরিয়ে পড়ার যে পরিকল্পনা ছিল তা বরবাদ হল। বেরোতে বেরোতে সাড়ে ১০টা। আবার সেই খারাপ রাস্তা। ব্রহ্মপুত্রের ওপর ছোট্ট ব্রীজটা পেরোতে পেরোতে ভাবছিলাম, এই পোড়া পুঁচকে ব্রীজ, এর জন্য ৩২০ কি. মি. বাড়তি আসা! ফেরার সময় কী লেখা আছে কপালে কে জানে। মাত্র ৬০ কি. মি. গিয়েই সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা সাম্সাং নামক গ্রামে। ছোট ছোট লজ আছে টুরিস্টদের জন্য। একটা লম্বা লজে পরপর ১০টা খাট। তাতে স্পঞ্জের তোষক একটা লেপ একটা বালিশ। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে গরম জল ভরা একটা ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কগুলো ভালো। ৪৮ ঘণ্টা জল গরম থাকে। ঘরের দেওয়ালে বহু বিচিত্র ছবি আঁকা। গ্রামের বাইরে ছোট ছোট দু-চারটে তাঁবু দেখে ঔৎসুক্য হল। গিয়ে দেখি দোকান। দোকানে কী নেই! দড়ি, মগ, বিসেলারী বোতল, কোকাকোলা, জুতো, লাঠি, কেরোসিন, লম্ফ, ছুরি-কাঁচি, সোয়েটার, টুপি, কালো চশমা, ক্যামেরা, ঘড়ি, ব্যাটারি, টেপ রেকর্ডার, মায় বিয়ারের বোতল পর্যন্ত। কিন্তু খাতা-কলম-পেন্সিল নেই। কোনো বইও নেই। চীন সরকার তিব্বত থেকে লেখাপড়ার বালাই চুকিয়ে দিয়েছে। ওরা চায় না তিব্বতীরা শিক্ষিত হোক, কারণ তাহলে তারা সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করবে। সিঙ্গাপুর থেকে সুরেশ মহারাজ প্রচুর খাতা, কলম এনেছিল। এবং যেখানেই চা-খেতে বা লাঞ্চ খেতে আমরা থামছিলাম, বাচ্চা, যুবক-যুবতীকে খাতা-কলম বিতরণ করছিল। অবশ্য গোপনে গোপনে।

আমরা সাগায় পৌঁছে দেখলাম, সত্যিই জলস্ফীতির কারণে ফেরি বন্ধ ছিল। সাগায় রাত্রিবাস। পরদিন অন্ধকার থাকতেই বেরুলাম—বিশাল কনভয়। ১০টা টয়োটা, তিনটে ট্রাক। পারিয়াং পৌঁছে আবার রাত্রিবাস। অদ্ভুত ব্যাপার—বড় বড় ডাঁশ মশা রাশি রাশি। এত উঁচুতে! তবে রাত গভীর হলে তাদের উৎপাত নেই। পারিয়াং থেকে জোংবা নদীর পাড়ে পাড়ে চলল কনভয়। জোংবা গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের সমান্তরাল চললাম আমরা। বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ এক জায়গায় গাড়ি থামল। মাঠের মতো বড় এবং উঁচু একটা স্থানে বৌদ্ধ পতাকার সারি। মাঝখানে লম্বা উঁচু খুঁটি। তার ওপর থেকে দড়ি দিয়ে নেমে এসেছে অনেক মন্ত্র লেখা পতাকা। গাড়ি থেকে নেমে দেখি সামনে মানস সরোবর। মনে মনে পুলকিত হলাম। দূরে ডানদিকে কৈলাস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আংশিক মেঘাবৃত। দূরবীন বের করে দেখলাম। শ্রীলঙ্কার দম্পতি একটা দূরবীন দেখিয়ে বলল— এটা আপনার দূরবীনের চেয়ে ভালো। দেখুন। আমারটা তখন হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় আছে হদিশ পাওয়া ভার। ভাবলাম ঝগড়া করবো কিন্তু মনটা ভালো ছিল বলে আর করলাম না।

রাত্রে তাঁবুতে থাকা। মানসের তীরে। আজ জন্মাষ্টমী। ২২ অগস্ট। রাত্রে

শ্রী কৃষ্ণস্বামী ভাগবত পাঠ করলেন—dining tent-এ। ছোট্ট dining tent. তার মধ্যে ৩০ জন বসে আছে। কেউ উলটে পড়ে গেল। কেউ খিচুড়ির ডেক্‌চি নিয়ে ঢুকছে, টিম্ টিম্ করে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। সরু লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী, কৈলাসপতি মহাদেবের ছবি। তার সামনে ধূপ জ্বলছে। একটা অদ্ভুত পরিবেশ। আগামীকাল মানসের তীরে হোম হবে। সব উপকরণ সঙ্গে আনা হয়েছে।

মানসের তীরে দুদিন তাঁবুতে কাটিয়ে, পরিক্রমা করে (৯০ কি. মি. সময়ের অভাবে অর্ধেকের বেশি গাড়িতেই হল), কৈলাস পর্বতের পাদদেশে দারচেন গ্রামে পৌঁছলাম ২৪ অগস্ট। তিব্বতী মেয়েগুলো হাজার রকম পাথর আর পাথরের মালা নিয়ে এসে উৎপাত করতে লাগল। বলে—হিন্দু লামা? টেন ইউয়ান। যদি বলি—নো। বলবে—কাজী লামা (অর্থাৎ দুষ্টু লামা)। দারচেনের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। সোজা নেমেছে কৈলাস পর্বত থেকে। আর একটি নদী কৈলাসকে যেন প্রদক্ষিণ করে এসে মানসে পড়েছে। আমাদের প্রদক্ষিণের পথও ঐ নদী বরাবর। ৫৬ কি. মি. প্রদক্ষিণ—তিন দিনে। গাড়ির পথ নেই। কেউ কেউ ঘোড়া পেয়েছেন। কেউ কেউ পাননি। কিন্তু কাউকে দমিয়ে রাখার জো নেই। অবশ্য চার পাঁচ জন বয়স্ক মানুষ দারচেনেই থেকে গেলেন। প্রথম রাত দেরেলফুক্ গ্রামে। এখানে কৈলাসের north face এর অপূর্ব রূপ দেখে আফশোশ হচ্ছিল—কেন ক্যামেরা নিয়ে এলাম না। দ্বিতীয় রাত্রি জিথুলফুক্ গ্রামে। মধ্যবর্তী দোলমা পাস ১৯৫০০ ফুট উঁচু। দুপুর ১২টার মধ্যে যদি না পেরোনো যায়, তাহলে প্রচণ্ড বাতাস শুরু হয়ে যায়। রাত্রে দেরেলফুকে -দুই°/-তিন° মত তাপমাত্রা ছিল। দোলমা পাস পেরিয়ে একটা গ্লেসিয়ার আছে। আমরা আকাশ পরিষ্কার পেলাম অর্ধেকটা। জিথুলফুক গ্রামে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি শুরু হল। সেখানে ওই বৃষ্টির মধ্যেই শেরপারা তাঁবু খাঁটিয়ে দিল। ঐ ঠাণ্ডা, তার ওপর বৃষ্টি। কৈলাস দর্শনে কিন্তু কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। গৌরীকুণ্ডে বেলা আর রমেশ গেছিল। আর কেউ যেতে পারেনি। পরিক্রমা করে দারচেনে সকলে ফিরে আসেনি। মাঝপথেই গাড়িতে তাদের তুলে নিয়ে হোরচু গ্রামে রাত্রি যাপন করলাম আমরা। আপাতত দর্শনের তৃপ্তি আর মানসে স্নানের স্মৃতিতে সকলে ভরপুর। এবার ফেরার পালা। একই রাস্তায়। অবশ্য আমাদের জন্য প্রচুর ধস্ অপেক্ষা করছিল। অবশেষে ৩ সেপ্টেম্বর ফিরলাম কাঠমাণ্ডুতে।

শোক সংবাদ

প্রাক্তনী সংসদের কয়েকজন সক্রিয় সদস্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরকালের জন্য। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুশীল মল্লিক, সংসদের সর্বকর্মের নিত্যসমর্থক সনৎকুমার মিত্র, উদ্যোগী বিশিষ্ট প্রাক্তনী অমরনাথ দত্ত এবং 'রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' তহবিলের একক দাতা তারাপদ দাস মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন সাম্প্রতিক অতীতে। সংসদের সঙ্গে এঁদের আন্তরিক সহযোগের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। তাঁদের প্রেরণা আমাদের আগামী দিনের পাথেয় হবে এবং তাঁদের স্মৃতি আমাদের উৎসাহিত করবে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

দিনপঞ্জির পাতা থেকে

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

৭ এপ্রিল (২৪ চৈত্র) বুধবার, ১৯৫৪।

সকালবেলা। সবে মাত্তর প্রেয়ার থেকে ফিরেছি। মহারাজ ডেকে পাঠালেন। দিলেন একটা খারাপ খবর। মহেন্দ্রনাথ সরকার মারা গেছেন কাল রাতে। বিদ্যামন্দির থেকে যেতে হবে আমাদের কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে।... আমরা পাঁচজন প্রস্তুত হয়ে নিই। আমি, শুভেন্দু (রায়), মল্লিক। আর ইস্ট ব্লকের বর্ধনদা। মহারাজ খাইয়ে দিলেন যাবার আগে। কতক্ষণ লাগে ফিরতে কে জানে? প্রিন্সিপাল মহারাজ আর আমরা সেখানে পৌঁছলাম সকাল প্রায় সাতটার সময়। মৃতদেহ নিয়ে বেরোতে নটা বেজে গেছল। সৎকারের জন্য গেলাম কেওড়াতলায়— আমার সৌভাগ্য বলতে হবে এতবড় একজন মনীষীর নশ্বরদেহ বহন করার সুযোগ পেয়েছি।... এই রকম কাজ আমার এই প্রথম — এরকম কাজের অভিজ্ঞতারও দাম আছে। শ্মশানে গেলে মনটাই অন্যরকম হয়ে যায় যখন ভাবি একদিন আমাকেও আসতে হবে এ জায়গায়, তখন পৃথিবীটাকে খুব ভালো লাগে না। মানুষরা চিরদিন বেঁচে থাকলে বেশ হত, না—। ... ফিরে আসি বিদ্যামন্দিরে পৌনে দুটোয়... মহারাজ আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন, বলছিলেন রাত্তিরে তুই ভয় পাবি। হাসি পেল শুনে। এ কথাটা কয়েকবছর আগে হয়তো আমার পক্ষে খাটত কিন্তু এখন আর নয়... শরীর ভালো আছে।

হাঁ। বিদ্যামন্দিরের সেই সব দিন। ফুলের মতো ফুটে ওঠে— শিশির হয়ে ঝরে যায়। কবিতার মতো সুন্দর। সূর্যের মতো উজ্জ্বল। ওসব কথা যখন ভাবি তখন মনটা হু হু করে ওঠে। পাতলা কুয়াশার স্তর সরিয়ে মনে হয় দাঁড়িয়ে আছি ধুধু মাঠে। তেপান্তরের মাঠ। উন্মুক্ত প্রান্তরে উদার দিগন্তের নীচে। আমি একা— ভীষণ একা। নিখিল চরাচরে কেউ নেই আমার। ঠাঠা রোদ্দুর আর হাহা নিঃসঙ্গতা।...

তখনই তেজসানন্দজীর গমগমে গলাটা শুনতে পাই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেওড়াতলা মহাশ্মশান—মহারাজজীর কণ্ঠে নির্বাণষট্‌কম্— ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ/পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম/ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-/শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহহম্॥— আমার মৃত্যু নেই, ভয় ও জাতিভেদ নেই, পিতা, মাতা ও জন্ম নেই, বন্ধু নেই, মিত্র নেই, গুরু ও শিষ্য নেই, আমি চিদানন্দরূপ শিব; আমি শিব।... আমি একা।...

সেই ২৪ চৈত্র, বুধবার, ১৩৬১। লেখা আছে আমার রোজনামচার পাতায়।

হাঁ, মহাশ্মশান। প্রিন্সিপাল মহারাজ আর আমরা চারজন। আমি, শুভেন্দু (রায়), শুভেন্দু (মল্লিক) আর ইষ্ট ব্লকের বর্ধনদা। আর এক জন সঙ্গে আছেন— তিনি মহেন্দ্র সরকার। ফুলে ফুলে শরীর ছাওয়া। মুখটা শুধু ভেসে আছে। পরম তৃপ্তির সাথে তাঁর নিদ্রা। তাঁর শেষ যাত্রা।

ইনি কে? জানি না। শুনেছি মস্ত বড় মনীষী। পণ্ডিত লোক— বিদ্বান লোক। আর এঁর বোধ হয় কেউ নেই। না থাক, আমরা আছি। সারা বিদ্যামন্দির আর আছেন তেজসানন্দজী। আশুতোষ কলেজের সামনে দাঁড়ালাম আমরা। শ্মশানযাত্রার ক্ষণিক বিরতি।

তাঁর নশ্বর দেহ বহন করা যেন এক সৌভাগ্য। আমরা কৃতার্থ। মহারাজের স্তোত্রে, আমাদের কণ্ঠে বেদ পাঠ—ওঁ সহ নাববতু / সহ নৌ ভুনক্তু... সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। আমাদের গলার স্বরে, ধূপের গন্ধে, রজনীগন্ধা, পদ্ম আর গোলাপের সুবাসে বাতাস মাখামাখি। মহারাজের অবিরাম পাঠ মন্ত্রের মতো সুন্দর। যেন দেবালয়ের পবিত্র পরিবেশ। পরণে গৈরিক বসন— গেরুয়া গেঞ্জি। গায়ের পাতলা চাদর এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছিল।

...শ্মশানে সার সার চিতা জ্বলে। লোক আসছে, লোক নামছে। লোক উঠছে— কাঠ পুড়ছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতার আগুন। কান্নার বিষণ্ণতায় বাতাস ভারী। হাওয়ার দমকে পোড়া গন্ধ ঘুরপাক খায়। মজা গঙ্গার সামনে বেলগাছের মাথায় কাক ডাকে। আকাশে শকুন ওড়ে।

এমন সময় লোকজন সরিয়ে নাচতে নাচতে এলো পাগলাবাবা। লাললাল ফুলোফুলো চোখ। আলুথালু জটা, জটা চুল। ছাইমাখা শরীর। এক হাতে সিঁদুর-মাখানো ত্রিশুল— অন্যহাতে সাদা পদ্মফুল। গলায় জবাফুলের মালা। পায়ে ঘুঙুর ঝমঝমিয়ে বাজে।

ঘুঙ্গুরের বোল তুলে, ত্রিশূল ঝাঁকিয়ে বার বার বলে ওঠে, 'আ গিয়া, আ গিয়া। এসে গেছে—এসে গেছে. সবাই আসবে— হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয়।'

নাচতে নাচতে আমাদের মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চায়। ঘুমিয়ে পড়া মানুষটার দিকে সরে আসে।

বর্ধনদার মাথায় খুন চাপে। কী এত বড় সাহস!

মহারাজজীকে ধাক্কা! চোখদুটো আগুন হয়ে দপদপিয়ে ওঠে। তেড়ে মারতে যায়।

ভ্রূক্ষেপ নেই বাবার। আকাশের দিকে ত্রিশূল ঝাঁকায়— হাতের ফুল নিয়ে লাফে লাফে ঘুরপাক খায়। ঘুঙুরের বোলে, পায়ের দাপে ধুলো ওড়ে। মুখে ডাকাতে হাসি। আমাদের মরদেহটার মাথার সামনে তালে তালে নাচে।

প্রিন্সিপাল মহারাজ বর্ধনদার হাত চেপে ধরেন— এই বর্ধন, কী হচ্ছে, কী? থাম, থাম,— কারো ভাব নষ্ট করতে নেই রে— নষ্ট করতে নেই।

এসব কিছুই শোনে না পাগলাবাবা। খাটটা ঘুরে ঘুরে ধেইধেই করে নাচে। নাচতে নাচতে শ্বেতপদ্মটা মাথার সামনে রাখে। আবার অন্য এক দিকে চলে যায়। সেখানে আগুন নিভে এসেছে, ধিকিধিকি জ্বলছে। মানুষগুলো আসছে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে— কী থাকে শেষ পর্যন্ত? এইতো শুধু ক'মুঠো ছাই।

পাগলা সাধুর দেওয়া শ্বেতপদ্ম যেন আমাদের বয়ে আনা শবদেহের মাথায় ফুটে আছে। শ্বেতকমল। অন্য কোনো রঙ নয়— সাদা।

প্রিন্সিপাল মহারাজ বলেন,— 'পাগল হলে কী হবে— তাল আছে। মাথার ধারে পদ্ম— শতদল। শ্বেতপদ্ম।'

মহারাজ অস্ফুট কণ্ঠে সুর করে বলেন— 'হৃদিপদ্মে আছে মানস সরোবর,/ অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর। ... তদূর্ধ্বে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর, / সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর...'

কথাগুলো আগুনের ধোঁয়ায় ঘুরপাক খায়। মহারাজের কালো ফ্রেমের চশমা ঝাপসা হয়ে আসে। চাদর দিয়ে চশমার কাঁচ মোছেন। এই পরিবেশে আমরা সবাই কেমন বিষণ্ণ— কিন্তু তাঁর মুখের হাসিটা লেগেই আছে। সূর্যের আলোয় গেরুয়া বসন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চোখে মুখে আগুনের লালচে আলো ঝলসায়। তিনি যেন নির্বিকার, উদাসীন।

তিনি হাসেন। কেমন এক রহস্যের হাসি। ভিড় থেকে একটু দূরে সরে আসেন।

'পড়াশুনার বাইরে আরেকটা জগৎ আছে। পরা আর অপরা। অপরা বিদ্যা অনেকেরই হয়— কিন্তু পরা ধরতে পারে ক'জনায়? পড়া কিন্তু পরা নয়।' মহারাজ একটু থামেন। দূরের আকাশে দৃষ্টি মেলে ধরেন। আবার বলেন, 'মাথার কাছে শতদল-পদ্ম। এ যেন সহস্রদলের প্রতীক। সহস্রার। সব চক্র আর চক্র। ... স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র। ...ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না। ... আর কুলকুণ্ডলিনী—' বলেই হঠাৎ চুপ করেন— বলতে চাননি কিন্তু নিজের অজান্তেই যেন বলে ফেলেন। সঙ্কোচ হয় বুঝি! 'না, না এসব থাক, এসব থাক। এসব কি পড়লে জানা যায়? তিনি জানালে সব জানতে পারবি।'

বলতে বলতে একলা হয়ে গেলেন মহারাজজী। মজা গঙ্গার ঘাটের সামনে দাঁড়ান। বেলগাছটার পাশে নির্বাক নিশ্চুপ। গাছের ওপর কাক লাফায়। আকাশে চিল পাক খায়। গঙ্গার ঘোলা জলে মাটির ঘট, ফুল, মালা, বেলপাতা ঢেউয়ে দোলে। পাগলা সাধুর গলা থেকে থেকে ভাসে "আ গিয়া, আ গিয়া, ...হেসে নাও ...হেসে নাও ...দুদিন বৈ তো নয়।"

একটা যন্ত্রণায় ছটফট করি আমরা তিনজন, আমি, শুভেন্দু রায়, শুভেন্দু মল্লিক। বর্ধনদা সিনিয়ার— দাদা লোক— দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজের পাশে। এই শ্মশানে সব কেমন অর্থহীন। টাকা পয়সা, জীবন যৌবন— সব। 'দুদিন বৈ তো নয়।'

শুভেন্দু রায়ের দৃষ্টিটা কেমন উদাস হয়ে যায়। ধরা গলায় বলে, 'দূর ছাই, ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না। শ্মশান যেন কেমনতরো— বড় দুঃখের জগৎ।'

মল্লিক বলে, 'ঠিক বলেছিস এখানে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়— তাই না রে? মহারাজের কথাগুলো ধরতে পারলি?'

হ্যাঁ, সব যেন বড় শক্ত কথা। কলেজ হস্টেলে, পেছনের পুকুরটার ধারে মাঝে মাঝে আমাদের 'চর্চার' আসর বসে। সেদিন তো অভিজিৎ এসব কথাই বলছিল। এসব নাকি যোগের কথা। তপস্যার কথা। অন্ধকারে হীরের মত জ্বলজ্বল করে শরীরের পদ্মগুলো। সেগুলো চিনতে হয়। মাথা তোলে কুণ্ডলিনী। হিস-হিস শব্দে উঠে আসে— শিরদাঁড়া বেয়ে তাঁর ওঠা-নামা। উঠে আসে উপর দিকে— নাভিমূল বেয়ে হৃদয় ছুঁয়ে, কণ্ঠে ছোবল মেরে কপাল আর মাথার দিকে। সহস্রদলের কাছে। ওঠে নামে, নামে ওঠে। শ্বাসে প্রশ্বাসে। তখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

সেই আনন্দের স্বাদ পেলে কেউ নাকি ফেরে না। আনন্দ-সাগরে একটা অচিন ফুল হয়ে যায়। ভাসতে ভাসতে চলে যায় অচিন কোন এক দেশে।

অভিজিৎ বলেছিল— 'এই যোগতপস্যায় দারুণ ক্ষমতা জন্মায় বুঝলি। মুখ দেখলেই সব বলা যায়। জানা যায় ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ। টাকা-পয়সা যা চাইবি পাবি। আর অত পড়াশুনার দরকার কী? চোখ বুজলেই মনে মনে জানতে পারবি পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো। সেগুলো পড়ে গেলেই হলো— কেল্লা ফতে।'

আমরা হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। আমি, অমলেন্দু, শীতল।

অভিজিতের মুখটা করুণ হল, 'ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তাহলে তো সবাই পারত। এগুলো ভাল যেমন করে, তেমন খারাপও। তারাপদ মহারাজ কমনরুমে কী বলেছিলেন মনে নেই? এসব করতে গিয়ে নাকি সিদ্ধাই এসে যায়। ঠাকুর নাকি বলতেন "সিদ্ধাই, সিদ্ধাই— ওয়াক থু।" সিদ্ধাই যত কাছে জগদম্বা নাকি তত দূরে।'

তারাপদ মহারাজ বলেছিলেন, 'পড়াশুনা করতে এসেছিস পড়াশুনা করে যা। ওসব খবরে কী কাজ? আম খেতে আসা আম খেয়ে নে— বাগানে কত গাছ, ডালপালা, কত পাতা এসব জেনে কী লাভ? ঠাকুরকে যেমন আরতি করিস, পুজো করিস— এসব চালিয়ে যা। আর কিছু দরকার নেই।'

শ্মশানে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছিলাম। ঠাকুরের প্রতি রাগ হচ্ছিল— সিদ্ধাই ...ওয়াক থু, এরকমটি কথা আপনি কেন বললেন ঠাকুর? ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে নারি। অর্থ চাই—গাড়ি চাই—বাড়ি চাই—সুখ চাই—এসব চাই। আপনার জগৎটা অদ্ভুত—বুঝতে পারি কই? সিদ্ধাই চাই ঠাকুর, চাই ক্ষমতা— সিদ্ধাই।

ঠাকুরকে শ্মশানে মনে মনে এই কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ মাথায় যন্ত্রণা— চোখে অন্ধকার। এক লহমায় কী হয়ে গেল মনে নেই। সম্বিৎ ফিরতেই দেখি জড়িয়ে ধরে আছেন বর্ধনদা। দুই শুভেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলছে— 'কী হল তোর? হঠাৎ কী হল? পা টলছে, মাথা ঘুরছে নাকি?'

মহারাজের কণ্ঠে স্নেহ ঝরে, 'সেই সাতসকালে বেরোনো— ছেলেমানুষ— অত ধকল কি সহ্য হয়! চল চল— বেলগাছটার ছায়ার নীচে বসবি চল।'

আমার হাত ধরে বেলগাছটার তলায় নিয়ে এলেন মহারাজজী। সূর্যের রোদ আড়াল করে দাঁড়ালেন। ছায়া পাই। তাঁর ছায়ায় বসে তখনও বুঝতে পারি না কী হয়েছিল।

মনে মনে কান মুললাম, নাক মুললাম-খৎ দিলাম ক্ষমা করো ঠাকুর, ক্ষমা করো।...

...এক সময় চিতা নিভল। ছাই ঘেঁটে, কাঠ সরিয়ে, কাঠি দিয়ে পাগলাবাবা খুঁজে খুঁজে বার করে নাভিকুণ্ড। ছাই, শুধু ছাই— পঞ্চভূতের শরীর মিশে গেল পঞ্চভূতে। মাটির ঘটে নাভিকুণ্ডের গঙ্গায় বিসর্জন— সঙ্গে গাঁদা ফুলের মালা।

পাগলাবাবার কণ্ঠটা ভাসে— 'হেসে নাও— দুদিন বৈ তো নয়।' হো হো করে হেসে ওঠে বাবা।

সেই হাসিটা যেন বাতাসে বাতাসে চিতার ধোঁয়ার আগুনে খলখলিয়ে ওঠে। মহারাজজি আকাশের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করেন। দেখাদেখি আমরাও।

কাকে প্রণাম করলেন মহারাজ, কাকে? মনে হল তাঁকে। তাঁর ইচ্ছেয় তো মানুষের কীর্তি, যশ, মান, সম্মান। মানুষ চলে যায়, মানুষের কিছু থাকে না— রেখে যায় কীর্তি। এসবের পেছনে থাকে সেই শক্তির বিশেষ প্রকাশ। এ যেন তাঁকে প্রণাম— সেই শক্তিকে প্রণাম। চলে গেলেন আজ মহেন্দ্র সরকার।

শেষ হয়ে গেল সব। চৈত্রের আকাশে সূর্য তেতে উঠছে ক্রমে। আমাদের কোমরে গামছা জড়ানো। বাড়ি ফেরার আগে চান করতে হয়। এই নাকি নিয়ম। আমাদের চান করতে হবে নাকি এই মজা, ঘোলা জলে?

মহারাজজী সন্ন্যাসী। তাঁর কোনো নিয়ম নেই— এসবের উর্ধ্বে। কিন্তু আমাদের?

মহারাজ বললেন, 'না, মনেতেই সব। মনই সব। মনেতেই পঙ্ক—মনে পঙ্কজ। মনেতে বদ্ধ আর মনেতেই মুক্ত। গঙ্গা তো আমাদের ওখানেও আছে। আছে হস্টেলে তোদের প্রিয় পুকুর। সেটা গঙ্গা ভাবলেই হলো। জলশুদ্ধি করে নিবি— হোক না পুকুরের জল— গঙ্গে চ, যমুনে চ, গোদাবরী সরস্বতী... তোরা কি এখনও পূজো করা শিখিসনি? এই বিশু, নৃপেন মহারাজ তো তোকে শিখিয়েছেন। গতবার সরস্বতী পুজোয়— তাই না?' আমি চুপ করে থাকি।

ওদিকে আকাশে পাক খেয়ে খেয়ে চিল উড়ছে, কাক উড়ছে, শ্মশানের বেলগাছটার মাথায় শালিখ নাচছে। তেজসানন্দজীর কথাগুলো ভাব এনে দিয়েছে মনে।

আকাশে চিলের দিকে তাকিয়ে ভাবি, না নীচের দিকে তাকাব না। ভাগাড়ের দিকে নজর নয়। হব এই মহারাজের মতন— সুখে দুঃখে অচঞ্চল— নির্বিকার। জ্বলে উঠব প্রদীপের মতন তেজের সঙ্গে, সাহসে বিক্রমে। ঠিক সেই দেবালয়ের জাগপ্রদীপ। নেভে না, কোনদিন নেভে না।... মনে মনে বললাম, তাই করে দাও ঠাকুর। চিল নয়, শকুন নয়— একটা পাখি, যে-সে পাখি নয়, হোমা পাখি নয়ত চাতক পাখি...

সেসব কথা যখন ভাবি তখন এমন ভালবাসা জাগে, শ্রদ্ধা আসে। ঘোর লাগে মনে তা ছড়িয়ে থাকে বুঝি অনুভূতির সীমানায়। মনে হয় আমার কেউ নেই, পিতা মাতা বন্ধু মিত্র—না না কেউ নেই— এই বিশ্বচরাচরে আমি একা শুধু একা।

চতুর্দশ পুনর্মিলন উৎসব

রবিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১

অনুষ্ঠান-সূচী

উদ্বোধন (পতাকা উত্তোলন)	:	সকাল ৮টা
পূজা	:	৮টা ১৫ মি.
প্রাতরাশ	:	৮টা ৩০ মি.— ১১টা
ভলিবল ম্যাচ	:	৯টা—১০টা
পুনর্মিলন সভা (প্রথম পর্ব)	:	১০টা ৩০ মি.— ১২টা ৩০ মি.
আলোকচিত্র গ্রহণ	:	১২টা ৩০ মি.—১টা
মধ্যাহ্ন ভোজ	:	১টা ১৫ মি—২টা ৪০ মি.
পুনর্মিলন সভা (দ্বিতীয় পর্ব)	:	৩টা ১৫ মি.—৪টা ৪৫ মি.
জলযোগ	:	৪টা ৪৫ মি.— ৫টা ১৫ মি.
সন্ধ্যারতি	:	৫টা ৩০ মি.
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	:	৫টা ১৫ মি.—৭টা ১৫ মি.

বীরেনদা

সমীর সেনগুপ্ত

খেলাধুলোয় আমি কোনোকালে ভালো নই, কারণ চশমা নিতে হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। বিদ্যামন্দিরের বয়স পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ির খেলাগুলো খেলতে চাইতুম একগুঁয়ের মতো, না পারলে রাগ হত নিজের ওপর, যারা ভালো খেলত তাদের হিংসে করতুম। ফুটবল মাঠে খেলতে নামতুম ইশকুলে পড়ার সময়, কিন্তু খানিক পরেই দলের ওস্তাদ খেলুড়েরা আমার স্থান নির্দেশ করে দিত গোলে— সব দলেই দুর্বলতম এলেবেলে ছেলেটিই গোলে খেলে। সেইভাবে খেলতে গিয়ে দুটো চারটে বল আটকে ফেলে ধারণা হয়েছিল আমি বুঝি ভালোই খেলি গোলে। বিদ্যামন্দিরে আমাদের ব্যাচে গোলকিপার ছিল জয়ন্ত গুপ্তরায়— চমৎকার খেলত, উড়ে গিয়ে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দিত। সাইড-লাইনের ধারে বসে বসে দেখতুম আর হিংসে করতুম জয়ন্তকে।

আর যেন জীবন্ত দেবতা দেখছি, এইভাবে তাকিয়ে থাকতুম বীরেনদার দিকে।

বীরেনদা (বীরেন রায়) ছিলেন আমাদের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটার। যে সব ছেলেরা ব্যায়াম করতে চাইত তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন, অন্যান্য খেলাধুলো করাবার ভারও ছিল তাঁর উপর। আমাদের চেয়ে বয়সে খুব একটা বড়ো ছিলেন না— এখন মনে হয়, বাইশ-তেইশের বেশি বোধহয় বয়স ছিল না তাঁর। কী রূপবান পুরুষ ছিলেন বীরেনদা! গায়ের রঙ কালো, বেশ কালো; কিন্তু আয়ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, ত্রিভুজাকৃতি মুখ, ঘাড় পর্যন্ত ঢেউখেলানো চুলের রাশি, সিংহের মতো সরু কোমর, কবাটের মতো চওড়া বুক নিয়ে অপার্থিব ধরনের সৌন্দর্য একটা— আমার বালকচোখ যে ভুল দেখেনি তার প্রমাণ, পরে বড়ো হয়ে ছবি দেখে বুঝেছি, মিকোলাঞ্জেলোর করা ডেভিডের মূর্তির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল বীরেনদার। সেই রকম গর্বিত দৃষ্টি, মাথা তুলে চোখে চোখ রেখে কথা বলার শান্ত কিন্তু বেপরোয়া একটা ধরন, দার্ঢ্যের সঙ্গে লালিত্যের সেই অপরূপ সংমিশ্রণ। রিঙের ওপর ভর করে শরীরটাকে অবলীলায় শূন্যে পাক খাওয়াতেন বীরেনদা, যেন যা খুশি তাই করতেন নিজের শরীরটাকে নিয়ে। আমি রিঙের নাগালই পেতাম না, একদিন অবহেলায় বেড়ালছানা তোলার মতো করে আমার কোমর ধরে তুলে দিয়েছিলেন রিঙে, মিনিটখানেক কেবলরামের মতো ঝুলে থেকে ঝুপ করে নেমে পড়েছিলাম।

বিদ্যামন্দির থেকে বেরিয়ে বীরেনদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। স্কুটারে চেপে যাচ্ছেন। উনি আমাকে স্বভাবতই চিনতে পারেননি, আমি পরিচয় দিয়ে আলাপ করলাম। বীরেনদা কাস্টমস-এ চাকরি নিয়েছেন, অ্যাপ্রেজার-এর চাকরি। শুনে খুশি হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কাস্টমস— অ্যাপ্রেজার! মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড কাস্টমসে চাকরি করছে?

লাল আলো সবুজ হয়ে গেল, স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেলেন বীরেনদা। আমি যা কোনোকালে পারতুম না, সে জিনিসটা যিনি অবলীলায় করে দেখাতে পারতেন, আর সেই জন্যে আমার বালক থেকে কিশোর হয়ে ওঠার বয়সে আমার মনে প্রায় দেবতার স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি এক ধাক্কায় দেবতার স্তর থেকে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এলেন। অথচ, ভেবে দেখতে গেলে বীরেনদা ঠিক কাজই করেছিলেন। সামান্য ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের কাজ ছেড়ে কাস্টমসে কাজ নিয়ে, খুব স্বাভাবিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের ভিতরেই যে পনেরো বছরের বালকটি চিরকাল থেকে যায়, ভাবমূর্তির জগৎ থেকে বীরেনদার এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসাকে সে সহ্য করতে পারেনি। স্কুটারে অপসৃয়মাণ বীরেনদার অসাধারণ সুন্দর ও সুগঠিত কাঁধের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, বীরেনদার সঙ্গে এভাবে আর দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হত।

পরবর্তী কুড়ি বছরে আরো তিনচারবার দেখা হয়েছে বীরেনদার সঙ্গে—ওই পার্ক স্ট্রিট থেকে ডালৌসি এলাকার মধ্যে। ক্রমে বয়সের ছাপ পড়তে দেখলাম তাঁর মধ্যে, সেই বড়ো বড়ো ঢেউখেলানো চুলে হালকা শাদা শাদা ছোপ পড়ল, বাটালি দিয়ে কোঁদা উদরের ওপর পাতলা মেদের স্তর জমল বয়স হওয়া অন্য লোকেদের মতোই। বীরেনদা মানুষটি ভারি সজ্জন ও অমায়িক, দেখা হলে মধুর করে হেসে কুশল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তাঁর উপর থেকে বীতরাগ আমার দূর হতে চায় না। একদিন অবসর নিলাম চাকরি থেকে, ডালৌসি পাড়ায় যাবার আর উপলক্ষ রইল না, বীরেনদা কোথায় থাকেন জানি না, দেখা হবার আর সম্ভাবনা নেই, তা ছাড়া তিনিও এত দিনে নিশ্চয়ই অবসর নিয়েছেন, আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ো তিনি। কিন্তু এখনো মনে হয়, বীরেনদা যদি চিরকাল থেকে যেতেন শরীরচর্চার জগতে, বালক ও কিশোরদের বিস্ময় হয়ে, তাহলে বড়ো ভাল হত যেন। বীরেনদার চোখে যদি এই লেখাটা পড়ে, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন— আমার প্রথম কৈশোরের অন্যতম আইডল বীরেনদা।

কবিতা

ভাবের অভাব

ওদের সবই আছে
বেশভূষা, বইখাতা, খেলাধূলা—
বেশ কিছু পোষাকী ভদ্রতা;
ভাবের অভাব শুধু,
ভুলে যায় ছাত্র কাকে বলে!
ছাত্র কি কখনো ভোলে
শিক্ষকের অকথিত ব্যথা?
অকথিত উপদেশ, বোধ
চাবুক কষায় না কি মনে?
ক্লান্তিহীন ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম আর
অলস চিন্তায় ক্লান্ত এরা!
শিক্ষা শিক্ষক কিংবা জ্ঞান অনুরাগ
জীবনের মূল্যবোধ— সব কিছু
ফুটো পয়সার মতো মূল্যহীন।

তবুও শিক্ষক থাকে, থাকে ছাত্র,
নিখুঁত নিয়মে ঘণ্টা বাজে— আর
সত্যকাম নচিকেতা একলব্য
কীটদষ্ট পুঁথির পাতার থেকে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হায় ছাত্র!

বেলাশেষ

সব ছেড়ে যেতে হবে—
সযতনে রাখা এই প্রাণের পুতুল, আম-কুশি, কড়ি,
জঙ্গম বন্ধুত্ব, প্রেম, আসা-যাওয়া, ঘর-পথ-ঘাট।
তবুও মানুষ স্বপ্নের গম্বুজ গড়ে,
ধরতে চায় আকাশের চুড়ো
আগলে থাকে বাকসো ও পুঁটুলি,
আর লোহার সিন্দুক!
রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর— এদেশে আজ ক্যালেন্ডারের মুখ

বাতাসে ঝাপটায় চটা-ওঠা দেওয়াল।
তাই আজও হারিয়ে ফেলার দুঃখ,
ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা
মনকে কাঁদায়, ভাঙে, পোড়ায়।
যদিও ঠিকই জানি— ছেড়ে যেতে হবে সবকিছু
এই প্রেম কিংবা অ-প্রেম, দেওয়া-নেওয়া,
ঘৃণা ও বিদ্বেষ— ছেড়ে যেতে হবে,
ছেড়ে যেতে হয়, তাই।

বিদ্যামন্দিরের কাছে আমি ঋণী

আব্দুরব-উর-রহমান

'এবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— এই বাংলায়'— যে তীব্র আবেগে কবি ভেসেছেন তা বাংলাকে কতখানি ভালবাসলেই না সম্ভব! যার সঙ্গে নাড়ির টান অন্তরের যোগাযোগ বারবার মানুষ তার কাছে ছুটে যেতে চায়। যে কোনো দূরত্বকেই সে অবহেলায় অতিক্রম করতে পারে, সে যে বড় আপনার। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও আমার সেই সম্পর্ক। ছোট্টবেলায় দশ-এগারো বছর বয়সে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে হন্যে হয়ে মা-বাবা হাজির হন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরে। সে ছিল এক কষ্টকর সময়। পাড়া-প্রতিবেশীদের চাপ, মুসলমান হয়ে কি না পুজো করবে! মহারাজরা রসিকতা করতেন, নেড়ের ছেলে সাধুসঙ্গে! সত্যিই তাই, আমি প্রার্থনার সময় হারমোনিয়াম বাজাতাম, মন্দিরে ঠাকুরের অর্ঘ্য সাজাতাম, ধোয়া-মোছা করতাম, ভোরবেলা আর সকলের সাথে কাড়াকাড়ি করে জবাফুল তুলতাম রামকৃষ্ণের পায়ে চড়াব বলে। জীবনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছিল হিন্দুদের রীতিনীতি, মনে হ'ত— আমি যে তোমাদেরই লোক। মহারাজদের সদা-সতর্ক দৃষ্টি ছিল— বিশেষ করে আমার উপর। পড়াশোনায় সামান্য গাফিলতি, আচার-আচরণের ত্রুটি মাত্রই 'গার্জেন কল'। আবার শরীর খারাপ করলে বাড়িতে ছাড়তেন না। বাবা-মা জোরাজুরি করলে বলতেন— আমরা আছি কী করতে? ওকে সুস্থ করে তবেই বাড়ি ছাড়ব। এমনই তাঁরা ছিলেন ছাত্র-দরদী।

মাধ্যমিক পাশ করার পর নানা টানাপোড়েন শেষে পুনরায় ঠিকানা হল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ। নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু-বান্ধব কিন্তু পুরনো রীতিনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা। তাই মানিয়ে নিতে অসুবিধা হল না। 'সুপার' হিসাবে পেলাম রাজা মহারাজকে (বর্তমানে স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ), যাঁর সাথে আমরা রসিকতা করে বলি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' অর্থাৎ উচ্চ-মাধ্যমিকের দু'বছর আর ডিগ্রি কোর্সের তিন বছরের সামগ্রিক যোগফল। 'অফিসিয়াল প্রিন্সিপাল' ছিলেন বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। এই সময় মাঝে মাঝেই আমাদের সঙ্গে রাজা মহারাজের মন-কষাকষি হত। একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। মিশনের ছাত্ররা সকলেই জানে হস্টেল থেকে সিনেমা দেখতে যাওয়া কী ভীষণ অপরাধ! একদিন সেটাই আমি করে ফেললাম আর কাঁচা চোরের মত ধরাও পড়লাম। ব্যস, তার যায় কোথায়! সে খবর পৌঁছে গেল সুপারের কানে, প্রিন্সিপাল মহারাজের কাছে, এমনকি বাবা-মা পর্যন্ত। গোটা মিশন জেনে গেল আবু পালিয়ে সিনেমায় গেছে। প্রিন্সিপাল মহারাজ তাঁর রুমে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে টানা আধঘণ্টা বকাঝকা করে গেলেন একটা সিনেমা দেখার সৌজন্যে।

এই সময় থেকেই প্রতি বছর দু'বার মিশনের ছেলেদের এবং মহারাজদের জন্য ঈদে সিমুই এবং লাচ্চা নিয়ে যেতাম। রাজা মহারাজ খুব ভালবাসতেন এই জিনিসগুলো এবং আমিও সবাইকে খাইয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেতাম।

আমি বরাবরই একটু নিজের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। নিজের ভাবনা-চিন্তা-মানসিকতা নিয়ে আপন খেয়ালে মগ্ন। এক বন্ধু আমাকে বলল, তুই লেখালিখি কর, যথেষ্ট ভাল পারবি। সে সময় আমি তার কথাকে তেমন আমল দেইনি। ভেবেছিলাম, ওসব বাজে কথা। তারপর একদিন আমাদের বাংলার অধ্যাপক মহীতোষ বিশ্বাস মহাশয় বললেন, বিদ্যামন্দির পত্রিকার জন্য একটা ভাল লেখা জমা দাও। কীভাবে যে নিজের মধ্যেকার সুপ্ত ইচ্ছাটি অজান্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ল বুঝতেও পারলাম না। এরপর প্রতি বছর বিদ্যামন্দির পত্রিকায় এবং আরও অন্যান্য ম্যাগাজিন, দেওয়াল পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হতে থাকল। বিদ্যামন্দির জীবনে এটাও আমার বড়ো পাওনা। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে চাপা-পড়ে-থাকা ক্ষমতাকে অনুভূতিকে সামনে নিয়ে আসতে, মনে হয়, একমাত্র বিদ্যামন্দিরই পারে।

তা না হলে, আমার মতো অতি সাধারণ ছেলে কী করে এত স্বপ্ন দেখতে পারে! জীবন নিয়ে 'ভাল' কিছু করা বা হওয়ার স্বপ্ন, 'মানুষ' হয়ে মানুষের পাশে থাকার কথা বিদ্যামন্দির আমাকে শিখিয়েছে। জাত-পাতের ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার উপরে উঠে মানুষের অধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে কখনো কি পারব না?

বিদ্যামন্দিরের ঘেরাটোপে মোড়া জীবনের পরে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই নিজেকে খুব মুক্ত লাগত। মহারাজদের চোখ-রাঙানি নেই, চব্বিশ ঘণ্টার রুটিন জীবন শেষ, আমি যেন এক লাফে অনেকখানি বড় হয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম বেশ ভালো লাগত, কিন্তু কিছুদিন চলার পর আমার মোহমুক্তি ঘটল। মিশন জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে বাইরের সমাজের সংঘাতে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। নিজেকে কেমন একা-একা লাগত, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে থাকল। ঐ সময় আবার বিদ্যামন্দিরের কথা খুব মনে

পড়ত। এখানকার বন্ধুরা, মহারাজরা বারবার স্বপ্নে আমাকে দেখা দিতেন আর বলতেন, চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চলাই জীবন, থেমে থাকা মৃত্যু। বুকে বল বেঁধে মনে সাহস রেখে নির্ভীক ভাবে যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া বিদ্যামন্দির থেকেই আমি পেয়েছি। আমার জীবনে কর্মে চিন্তা চেতনায় বিদ্যামন্দিরই অনুপ্রেরণা। মহারাজদের সততা উদারতার বিন্দুমাত্রও যদি আমি গ্রহণ করতে পারি ধন্য হব। বিদ্যামন্দির আমাকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বড়ো করেছে, মানুষ করেছে— এর কাছে তাই আমি চিরঋণী।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস ২০০০-২০০১

হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের পর এ বছরের বিবেকানন্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। খুবই অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে আয়োজিত এবারের সম্মেলন যথেষ্টই সাফল্য পেয়েছে। জেলার প্রায় ২০০টি স্কুলের ২০০০-এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এবং জেলার এক বিস্তারিত অঞ্চলে সম্মেলন নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ চোখে পড়ে।

প্রাথমিক পর্বে প্রাক্তনী সংসদের একক উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলেও এখন সম্মেলনের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় এটি আয়োজিত হচ্ছে যৌথ উদ্যোগে। বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীসংসদই মূল দায়িত্বে থাকলেও এবার সহযোগিতা করেছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদ, ইত্যাদি। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (দিল্লি)-এর আর্থিক সাহায্য এই সম্মেলন আয়োজন করতে এবারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

একটি প্রস্তুতি কমিটির নেতৃত্বে সমগ্র জেলাকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে এবারে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের পাঁচটি অঞ্চল ছিল— নরেন্দ্রপুর, সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, বারুইপুর এবং নিমপীঠ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝির মধ্যে আঞ্চলিক কমিটিগুলি আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতা সেরে ফেলে। চূড়ান্ত পর্বের অর্থাৎ জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিগত ২৩ ডিসেম্বর, নরেন্দ্রপুরে। আবৃত্তি, গান, গল্প বলা, বক্তৃতা, স্বামীজী বিষয়ক ক্যুইজ, সংগীত, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং যোগাসন।

প্রকাশ্য অধিবেশনসহ সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল স্বামীজীর জন্মদিবসের প্রাক্কালে— বিগত ৭ জানুয়ারি— নরেন্দ্রপুর অডিটোরিয়ামে। এই দিনের অনুষ্ঠান দু'টি পর্বে বিভক্ত হয়েছিল। প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্রপুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দজী মহারাজ। প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব তপনকুমার ঘোষ, প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক স্বামী সত্যাত্মানন্দ প্রমুখের ভাষণ ছাড়াও এইপর্বে একটি সুদৃশ্য স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবারে এই পত্রিকা প্রকাশনার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন প্রাক্তনী স্বামী সর্বগানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবারের কর্মযজ্ঞের মূল হোতা নরেন্দ্রপুরের উদ্যোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুনীল পট্টনায়ক মহাশয়। এরপর স্বামীজী বিষয়ক একটি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়— পরিচালনা করেন প্রাক্তনী সংসদের পক্ষে ডা. ধীমান গাঙ্গুলী।

মধ্যাহ্নভোজের পর দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। এই পর্বে স্বামীজী বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা করেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী। আঞ্চলিক আহ্বায়করা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিবেদন পেশ করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীরা দুই পর্বেই মাঝে মাঝে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে নিছক বক্তৃতার একঘেয়েমী কাটিয়ে দেয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ভাষণ দেন— বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ এবং অধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। এরপর প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি ড. বিশ্বনাথ দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয় অতঃপর। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলিকেও স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

এভাবেই এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন শেষ হল। সকলের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় এবারের সম্মেলন স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতেও যথেষ্টই সফল। উদ্যোক্তাদের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে পরের সম্মেলন নিয়ে।

২০০০-২০০৩-এর নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি

চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৫.৮.২০০০) ২০০০-২০০৩ সালের জন্যে প্রাক্তনী সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হল :

সভাপতি : নচিকেতা ভরদ্বাজ
সহ-সভাপতি : সচ্চিদানন্দ ধর ও বিশ্বনাথ দাস
সম্পাদক : তপনকুমার ঘোষ
যুগ্ম-সম্পাদক : দীপক ঘোষ ও গৌতম গোস্বামী
কোষাধ্যক্ষ : স্বপনকুমার চক্রবর্তী
সদস্য : তুহিনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস রায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়, নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিসকুমার সিন্‌হা, ব্র : জনার্দনচৈতন্য

এ ছাড়া বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক মহারাজ এবং অধ্যক্ষ মহারাজ পদাধিকার বলে কর্মসমিতির সদস্য রইলেন।

প্রবাসীর চিঠি

স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ

মস্কো
নভেম্বর ২০০০

প্রিয় দীপঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়ে খুব আনন্দ হল। সেই তোমার গানটি শুনেছিলাম নরেন্দ্রপুরে —পোহাল দুখ রজনী— মনটা ভরে গিয়েছিল।

দুটি বইয়ের নাম লিখছি— তোমার লাইব্রেরীতে রাখা অত্যন্ত উচিত। *Vedic Aryans and the Origin of Civilization* by N. S. Rajaram and David Franky ও *Politics of History* by N. S. Rajaram, Voice of India Publication, Delhi, Motilal Banarasidas-এ পাওয়া যায়। তাতে অনেক প্রামাণ্য তথ্য পাবে যা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা সম্প্রতি নয়ের দশকে অনেকগুলি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মুশকিল হল— ইউরোপীয়ানদের বস্তাপচা ইতিহাসগুলি আমাদের ছাত্ররা সাগ্রহে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে। রমিলা থ্যাপার বলে একজন দিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস বোর্ডের মাথায় চেপে বসে আছেন। তাঁর কমিউনিজম্ উবে যাবে বলে কিছুতেই ঐ পচা ইতিহাস পালটাতে দিচ্ছেন না এখনও। তবে আর কতদিন! স্বামীজী সাধারণ জ্ঞান হিসাবে বলেছিলেন বৈদিক সভ্যতা নয় হাজার বছরের কম হতে পারে না। ভারতীয় নতুন গবেষকরা বলছেন ওই ইতিহাস ১০ হাজার বছরের। শেষ তুষারযুগের বরফ গলার পর যে নদীমাতৃক ভারত প্রকাশিত হল তখনই ঐ সভ্যতার সৃষ্টি। ঋগ্বেদের যুগ গেল। তারপর এল উপনিষদের যুগ। এসব পালটাতে, বিশেষ করে প্রাচীন যুগে, কত সময় লাগে? ৫ শত বছর অথবা হাজার বছর। তারপর এল বেদাঙ্গ চর্চাদি, এল রামায়ণের যুগ, এল মহাভারতের যুগ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ৩১০২ খৃঃ-পূর্বাব্দে, বিভিন্নভাবে সুপ্রমাণিত। তারপর সূত্রযুগ— গৃহ্যসূত্র, অশ্বলায়ন, বিশেষ করে বৌধায়নের সুল্বসূত্র— যা থেকে পৃথিবীতে অঙ্কশাস্ত্র প্রচারিত হল। যা থেকে মোহাঞ্জদড় ও হরোপ্পার নগর সৃষ্টি সম্ভব হল। অঙ্ক ছাড়া ওইরকম শহর গড়া যায় না। ওই অঙ্ক পাওয়া যায় হুবহু ওই সুল্বসূত্র যাকে বলে বৈদিক অঙ্ক। তার অনুযায়ী প্রাচীর-নগর হরোপ্পা গড়া হয়েছিল। ওইটি দ্রাবিড়-সভ্যতা— একটা মস্তবড়ো বাজে কথা। মহাভারতীয় ধ্বংসের পর আবার ভারত দাঁড়িয়ে গেল ঐ সভ্যতা— বিজ্ঞানের প্রগতির সভ্যতা গড়ে তুলে। সবচেয়ে বাজে কথা— আর্যরা বাইরে থেকে এসেছিল।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় মহলে প্রচারিত একটি বার্ষিক পত্রিকা 'আর্যাবর্ত'— তাতে আমার একটি লেখা সাদরে ছাপানো হল ঐ বৈদিক সভ্যতার ওপর। পরবর্ষে আবার সনির্বন্ধ অনুরোধে লেখা দিলাম— Vedic Chronology. তাও ছাপা হবে শীঘ্রই। অন্য পত্রিকায়ও আমার লেখাটি পুনর্মুদ্রণ হল— অবশ্য রুশ ভাষায়। পণ্ডিত মহলে খুব সমাদর পেয়েছে— লেখা কিন্তু ঐ দুই বই থেকে। তা ছাড়া রাজারাম দুটি লেখা দিয়েছেন 'প্রবুদ্ধ ভারতে'। বছর তিন আগে শতবার্ষিক সংখ্যায় জানিয়েছেন— হরোপ্পার লিপি বাংলার এক পণ্ডিত পড়তে পেরেছেন। মুদ্রার ঐ ছবিগুলি গণ্ডার-ষাঁড়-এর বিচিত্র বিবরণ মহাভারতের শান্তি পর্বে আছে। অর্থাৎ মহাভারতের পর ঐ সভ্যতা— মহাভারতেরই বিস্তার আমাদের শ্রীকৃষ্ণ অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে গীতার সুমহান বাণী ঘোষণা করেছিলেন যা মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রীতি জেনো।

জ্যোতিরূপানন্দ

স্বামী সর্বগানন্দ
(দীপঙ্কর মহারাজ)

লেখক পরিচিতি

মলয়কুমার বসু (১৯৫৬-৫৮)

সুখ্যাত আইনজ্ঞ এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজের স্নেহধন্য ছাত্র।

গৌতম গোস্বামী (১৯৭৩-১৯৭৬)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের যুগ্ম-সম্পাদক। দূরভাষ : ৪৩০-০০৬০

তপনকুমার ঘোষ (১৯৬৯-৭৩)

অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক। বিশিষ্ট সংগঠক।

সচ্চিদানন্দ ধর (১৯৪১-৪৩)

বিদ্যামন্দিরের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাশীল লেখক এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। একাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩-৭৬)

সাহিত্য অকাদেমির পূর্ব ভারতের সচিব। সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে দেশে ও বিদেশে অংশ নিয়েছেন।

রুশতী সেন

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক এবং অধ্যাপিকা। ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত।

দেবেশ রায়

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক এবং সংবাদপত্রের কলামনিস্ট।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা।

শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য

সমালোচক এবং সরকারী প্রশাসক।

আশীষ বর্মন

গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

সমালোচক এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব প্রফেসার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

একাধিক রাজ্য এবং জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক।

স্বামী সর্বগানন্দ (১৯৭৩-৭৬)

বিদ্যামন্দিরের কৃতী ছাত্র এবং বর্তমানে নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সংগীতকার, একাধিক সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন। গানের বেশ কয়েকটি ক্যাসেট প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৯৫৩-৫৫)

বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং লেখক। 'ডাক্তারের ডায়েরি' 'অপারেশন এক্স' (গোয়েন্দা কাহিনী), 'ফাঁসি', 'আমাকে চেনো' (মানুষের শরীরের কথা) ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সমীর সেনগুপ্ত (১৯৫৪-৫৬)

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। 'অমৃত', 'দেশ', 'নাও' 'ফ্রন্টিয়ার', 'আজকাল' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যসমগ্র' সম্পাদনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর উপর একটি জরুরি বই প্রকাশ করেছেন।

সুনীল সিংহ রায় (১৯৫৫-৫৭)

কবি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (শুকচর)-এর প্রধান শিক্ষক।

আবু তৈয়ব-উর-রহমান (১৯৯২-৯৭)

কৃতী ছাত্র এবং প্রাবন্ধিক।

স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ (১৯৫১-৫৩)

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ সোসাইটি, বেদান্ত সেন্টার, মস্কো।